সোনার বাঙলা

২

॥ দ্বিতীয় খণ্ড : জনসঙ্গমে ॥

বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড
কলিকাতা বারো

প্রথম প্রকাশ—আষাঢ়, ১৩৬৪। জুন, ১৯৫৭

প্রকাশক—শচীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড

১৪, বঙ্কিম চাটুজ্জে স্ট্রীট,

কলিকাতা-১২

মুদ্রাকর—বরেন্দ্রকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়

দেশবাণী মুদ্রণিকা

১৪/সি ডি. এল. রায় স্ট্রীট,

কলিকাতা-৬

প্রচ্ছদপট-শিল্পী :

খালেদ চৌধুরী

প্রচ্ছদপট মুদ্রণ :

ভারত ফটোটাইপ স্টুডিও

বাঁধাই—বেঙ্গল বাইণ্ডার্স

ছ টাকা

॥আমার সোনার বাঙলা,

আমি তোমায় ভালবাসি॥
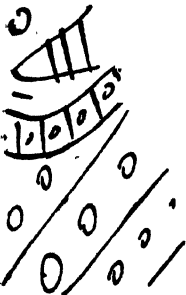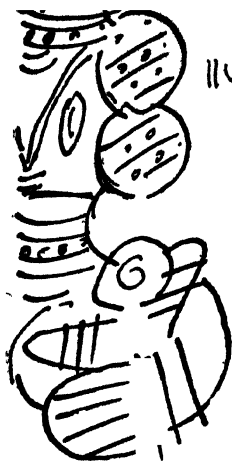
ইউরোপের বণিকরা যখন বাঙলায় ব্যবসা জমিয়ে বসেছিল তখন একটা কথা খুব চালু ছিল: বাঙলায় নাকি ঢোকার পথ আছে অনেক, বেরুবার পথ নেই একটিও। একথার মানে, এ দেশটা এমন লোভনীয় আর এত নিরীহ যে অনায়াসে এখানে এসে বসতি করা যায়, আর একবার এখানকার রস পেলে ফিরতে ইচ্ছে করে না। কথাটা অবশ্য ইউরোপীয় বণিকদের মাথা থেকেই প্রথম বেরোয় নি; শোনা যায়, ঠিক একই কথা চালু ছিল দিল্লীর মোগল বাদশাদের দরবারে। তাঁরা অবশ্য এ কথা বলেছিলেন একটু ভিন্ন অর্থে, লড়াইয়ের কথা মনে রেখে—সৈন্য নিয়ে বাঙলায় ঢুকে পড়া সহজ, কিন্তু নদীনালার এই দেশ থেকে শেষ পর্যন্ত প্রাণ বাঁচিয়ে ফেরা কঠিন।

হয়তো শুধু কোম্পানির আমলে নয়, শুধু মুঘল আমলে নয়, হয়তো সেই অতীত থেকেই কথাটা সত্যি। সেই যখন বাঙলাদেশ নদীতে-পলিতে, জলে-জঙ্গলে সত্ত্ব গড়ে উঠেছে, তখন থেকেই

ইতিহাসের অজানা অন্ধকার থেকে মানুষ এসেছে এখানে। যত এসেছে তত ফিরে যায় নি। কিসের আকর্ষণে বোঝা নামিয়েছে কাঁধের, ঘর তুলেছে বাসের, বসেছে থিতু হয়ে।

এ রকম ব্যাপার বাঙলারই একটা বৈশিষ্ট্য।

ভারতের পশ্চিম প্রান্তে কিন্তু ঠিক এ রকম হতে পারে নি। সেখানেও জনস্রোত এসেছে একের পর এক। আদিম মানুষদের সরিয়ে এসেছে এমন লোক যারা মোহেনজোদড়ো গড়ে তুলল। তাদের হটিয়ে এল বৈদিক আর্যেরা। তার পরেও এসেছে শক, হুন, পাঠান, মুঘল। কিন্তু শুধু আসাই। এসেছে পশ্চিম থেকে, চলে যেতে হয়েছে পুবে অথবা দক্ষিণে। পশ্চিম প্রান্তে শুধু একনাগাড়ে চলা। একদিক থেকে যত আসা, অন্য দিক থেকে তত যাওয়া।

পূর্ব প্রান্তে, বিশেষ করে বন-মাটি-নদীর যে অংশটাকে আমরা বাঙলা বলে চিনেছি, সেখানে ঠিক এমনটি হয় নি। বরং কেমন করে যেন এখানে সব চলা এসে থামতে চেয়েছে। মানুষের স্রোত এসেছে এখানে শুধু পশ্চিম থেকে নয়, পূর্ব থেকেও। পশ্চিমের ঝোঁকটা ছিল ছাড়া-ছাড়া হয়ে যাবার, পূর্ব প্রান্তে জড়ো হবার। ইতিহাসের শিব যেন সংঘাতের পর এমন একটা নিরিবিলি জায়গা খুঁজছিল যেখানে সমন্বয় সার্থক হবে। বাঙলাদেশের বিশেষ অবস্থান, তার বিশেষ ভূগোল যেন তাকে এগিয়ে দিল এই ইতিহাসের তপস্যার জন্য।

● অন্ধকারের দিনে

ইতিহাসের আগের অন্ধকারে হাজার হাজার বছর ধরে যা ঘটেছে তাকে যদি অল্প সময়ের মধ্যে টেনে আনি তবে একটা ছবি কল্পনা করা যায়। দেখা যাবে, নতুন-গড়া পলি আর জঙ্গলে-ভরা একটা জায়গার আশেপাশে এসে দাঁড়িয়েছে একদল মানুষ— কালো, বেঁটে, একমাথা পশমের মতো কোঁকড়া চুল। হাতে তাদের পাথরের হাতিয়ার। জঙ্গলের বড়ো বড়ো জানোয়ারই তাদের একমাত্র লক্ষ্য। তারপরেই হয়তো দেখা যাবে, প্রায় একই জায়গায় আর-এক রকমের মানুষ—জঙ্গলের বদলে তারা পছন্দ করেছে নদী, পশুর বদলে মাছ। নতুন পলির ঘাটে বানাচ্ছে ডোঙা। হয়তো এর পর দেখা যাবে নতুন লোক আসছে পুব থেকে, উপকূলের ধার ঘেঁষে-ঘেঁষে। চেহারায় তারা খুব বেঁটে নয়, খুব লম্বা নয়, মাথার চুল ঠিক কালো নয়, কটা-কটা। পলিমাটির কৃষি-সার্থকতা চিনে ফেলে তারা শুরু করেছে বিপুল ভাঙা-গড়া। ইতিমধ্যে হয়তো পশ্চিম-দক্ষিণ থেকে আসতে শুরু করেছে অন্য মানুষ— নতুন সভ্যতাসন্ধানী দ্রবিড় আর উত্তর-পশ্চিম থেকে পর-পর নানা ধরনের আর্য, একেবারে উত্তর থেকে হলদে-রঙ, গোল-মুখ পাহাড়ী মঙ্গোলীয়। পূর্ব, পশ্চিম, উত্তর, দক্ষিণ-পশ্চিম, দক্ষিণ-পূর্ব—সব দিক থেকে সব আসা যেন এখানকার তরুণ পলিমাটির মায়ায় এসে বাঁধা পড়েছে, আচারে ব্যবহারে হয়ে উঠেছে অনেকখানি পৃথক। যে অস্ট্রিকরা এল তারা ভুলে গেল কোথায় ছিল তারা। যে দ্রবিড়েরা এল তারা গমের বদলে শিখল ধানের চাষ। যে আর্যেরা এল, শাস্ত্র বললে

তারা ব্রাত্য। যে শক হুন লাট কর্ণাট অন্ধ্র শবর প্রভৃতি নানা জাতি-উপজাতির উল্লেখ পাওয়া যায় পালরাজাদের তাম্রশাসনে,

ইতিহাসের আগে যারা এসেছিল

তারা সবাই মিলে গড়ে তুলতে শুরু করলে বিশিষ্ট এক জাতিসত্তা-পরবর্তী কালে যার নাম হয়েছে বাঙালী।

আসা-যাওয়ার পাক খেয়ে-খেয়ে এই যে একটা কিছু বিশিষ্ট হয়ে উঠল তাকে আমরা বলেছি বাঙালী। কিন্তু এটা হল তার মোট সংজ্ঞার কথা। তন্নতন্ন করে এ বাঙালীর পরিচয় নিতে হলে তাই পাক খুলে-খুলে দেখতে হবে। পাক খোলার নানা পথ। তাই নানা পথেই এ পরিচয় পূর্ণ হওয়া সম্ভব। যেমন, যে জল-মাটিতে এই বিশিষ্টতা গড়ে উঠেছিল, তার পরিচয় নিতে হয় আগে। এ পরিচয়ের নাম হল বাঙলার ভূগোল। যে ঘটনা-পরম্পরা সময়ের পাকে জড়িয়েছে, সময়ের পাক খুলে তার চেহারা দেখাও একটা পরিচয়। সে পরিচয়ের নাম ইতিহাস। এমনি এক-একটা পরিচয় পাওয়া যাবে বাঙলার সাহিত্যে, শিল্পে, অর্থ-ব্যবস্থায়, রাষ্ট্রব্যবস্থায়।

পরিচয় গ্রহণের আধুনিক আর-একটি পথ হল জনতথ্য (ডেমোগ্রাফি)। তার পাকটা সময়ের পাক নয়, সংখ্যার পাক। সংখ্যায় সংখ্যায় বেড়ে মানুষের যে মোট সংখ্যাটাকে আজ আমরা বাঙালী বলছি, তার মধ্যে নানা গতি-পরিণতি, নানা ঝোঁক, নানা প্রবণতা বাঁধা পড়ে আছে। মোট সংখ্যাটা গড়ে উঠেছে ছোটোখাটো নানা সংখ্যা দিয়ে। মোট সংখ্যাটা বাঙলা দেশময় ছড়িয়ে পড়েছে নানা সংখ্যায়, নানা ঘনতায়, নানা খোপে, নানা হিসেবে। সামনা-সামনি দেখলে তার এক বিন্যাস, পাশাপাশি দেখলে তার এক চেহারা। জনবিন্যাসের এই বিচিত্র হিসাব-নিকাশের পরিচয় নেবার চেষ্টা করে দেখব, পশ্চিম বাঙলা এবং বাঙালী সম্পর্কে জানার মতো, কাজে লাগাবার মতো কী কী তথ্য আমরা পেতে পারি।

একটা দৃষ্টান্ত দিই। যদি দেখা যায় 'ক' দেশটার লোকসংখ্যা বছর বছর কমতে শুরু করেছে, তবে 'ক' দেশের অতীত ইতিহাস যত বড়োই হোক, সন্দেহ করতে হবে 'ক' জাতিটির ভবিষ্যৎ ভালো নয়। তখন আমরা ভাবতে পারি, কিসে সে ভবিষ্যৎ খুলবে। বন্য যুগ থেকে কৃষি-ব্যবস্থার যুগে যদি আমরা তাকাই, তবে দেখব, কোনো একটা ভূখণ্ডে বন্য যুগে মানুষের যে সংখ্যা তা হঠাৎ লাফ দিয়ে কৃষিযুগে ভয়ানক ভাবে বাড়তে শুরু করেছে। অবশ্য গুনতি করে হিসেব টুকে রাখার মতো কোনো ব্যবস্থা সে অতীতে ছিল না, কিন্তু নানা পরোক্ষ প্রমাণে পণ্ডিতেরা এইটে অনুমান করেছেন। সংখ্যার এই প্রমাণ থেকে নির্ভয়ে বলতে পারা উচিত, বন্য যুগের চেয়ে কৃষিযুগের ব্যবস্থা ঢের বেশী কাজের। আবার পুরানো জমিদারী ব্যবস্থার ইউরোপে যখন প্রথম কল-কারখানার যুগ শুরু হল, তখনো এক ধাপে মানুষের সংখ্যাবৃদ্ধির হার ভয়ানকভাবে বেড়ে উঠেছিল। এ-থেকে মানতেই হবে মনুষ্য-জাতির পক্ষে পুরনো জমিদারী ব্যবস্থার বদলে আধুনিক কলকার-খানার যুগ ঢের, ঢের বেশী অনুকূল—সাহিত্যে যদি কখনো কেউ অরণ্যকেই শ্রেয় মনে করতে শুরু করেন, তা সত্ত্বেও। তেমনি আবার ইংলণ্ডের সরকারী ভাষ্যে প্রায়ই বলা হত ইংরেজ শাসন নাকি ভারতবর্ষের প্রতি ভারি মঙ্গলজনক। জনসংখ্যার হিসেব নিলে দেখা যাবে অন্য ব্যাপার। ইংরেজ শাসনের প্রথম দিকে বাঙলার মানুষ কমতে শুরু করেছে। পশ্চিম আর উত্তরবঙ্গে দুর্ভিক্ষে, জ্বরে। এমনকি দুর্ভিক্ষ না হওয়া সত্ত্বেও পূর্ববঙ্গের ঢাকা প্রভৃতি এককালের বর্ধিষ্ণু শহরগুলি জনহীন হয়ে পড়তে শুরু করেছিল। তাহলে মানতেই হবে, ইংরেজ শাসন এ দেশে জন-

সাধারণের বৃদ্ধির পক্ষে অনুকূল হয় নি। অর্থনীতিবিদরা এই তথ্যকেই হয়তো আরো ব্যাখ্যা করে বলতে পারবেন, কেন। বলতে পারবেন, কেমন করে এদেশের প্রাচীন সমাজব্যবস্থা এবং শিল্প ইংরেজ শাসনে ধ্বংস হল অথচ নতুন কিছু তেমন গড়ে উঠল না।

জনবিন্যাসের এই সব নানা তথ্যের হিসাব নিতে গিয়ে প্রথমেই ধরা যাক, যা বলে শুরু করেছিলাম—যাওয়া-আসা। ইতিহাস এবং প্রাগিতিহাসের কালে যাওয়া-আসার কয়েকটা ঘটনাই আমরা মোটামুটি জানি। তাকে হিসাবের ছকে মাপতে পারি না। কিন্তু এ-কালের যাওয়া-আসা আমরা গুনতি করে ফেলতে পারি।

● একালের ছবি

যাওয়া-আসার এই স্রোত কিন্তু এখনো থামে নি। সভ্যতা যতদিন থাকবে, ততদিন তা থামবে না। এক-এক যুগে এক-এক রকমের আকর্ষণ টেনে এনেছে বহিরাগতকে। জমির টানে এসেছে আর্য ব্রাহ্মণ, রাজ্যের লোভে কর্ণাটী যোদ্ধা, ভাগ্যের সন্ধানে তুরুক ঘোড়সওয়ার, মুনাফার খোঁজে ইংরেজ বণিক। একালেও ভারতবর্ষ এবং ভারতবর্ষের বাইরে থেকে নানা লোক আসছে বাঙলাদেশে। টানটা এবার কলকারখানা আর জীবিকার টান। আজকেও যত আসছে, তত যাচ্ছে না। আজকেও ঢোকার পথ যত বেরুবার পথ তত নেই।

এই বহিরাগতদের মধ্যে অবশ্য মোট দুটো ভাগ করা উচিত। একদল হলেন ভারতবর্ষের বাইরে থেকে যাঁরা আসেন। এঁরা হলেন প্রধানত ইউরোপীয়। ভারতবর্ষ ইংরেজের অধীন থাকার

ফলে এতকাল এই ইউরোপীয় বহিরাগতদের সংখ্যা বেশ ভারী ছিল। বর্তমানে তা অনেক কমে গেছে।

অন্য ভাগটা হল ভারতবর্ষেরই অন্য প্রদেশ থেকে যাঁরা বাঙলায় আসেন।

আজ যাঁরা আসছেন

প্রথমে আমরা ভারতবর্ষের বাইরে থেকে যাঁরা বাঙলায় আসেন তাঁদের একটা হিসাব নেব। এতে একটা মুশকিল আছে।

কারণ, স্বাধীনতার পরে আগেকার বাঙলা দ্বিখণ্ড হয়েছে। এর ফলে আগে পশ্চিম বাঙলায় স্বভাবতই পূর্ব বাঙলার এমন অনেক লোক থাকতেন, যাঁরা একান্তই বাঙালী। কিন্তু রাষ্ট্রের ভাগ মানতে হলে, বর্তমানে তাঁদের বিদেশী বলে ধরতে হবে। এই জন্য হিসাব দিতে গিয়ে অভারতীয় বহিরাগতদের তিনটি ভাগ করা হয়েছে: পাকিস্তানের নাগরিক, নেপাল ও সিকিম থেকে আগত, এবং পৃথিবীর অন্যান্য দেশ, অর্থাৎ ইউরোপ, চীন প্রভৃতি দেশ থেকে যাঁরা এসেছেন। পরিশিষ্টে বাংলার বিভিন্ন জেলায় এই বহিরাগতদের সংখ্যা দেওয়া হল।

বলে রাখা ভালো, বহিরাগত বলতে ঐ তালিকায় শুধু তাঁদেরই ধরা হয়েছে, যাঁরা মোটামুটি দীর্ঘকাল যাবৎ এখানে বাস করছেন। যাঁরা অল্প কয়েক দিনের জন্য বেড়াতে এসেছেন, তাঁদের ধরা হয় নি।

এখন এই তালিকা থেকে বেশ কয়েকটা জিনিস বেরিয়ে আসে। প্রথমে পৃথিবীর অন্যান্য দেশ থেকে আগতদের কথা ধরা যাক। দেখা যাচ্ছে ১৯২১ সালের তুলনায় তাদের সংখ্যা ১৯৫১ সালে ভয়ানক কমে গেছে। এর কারণ আর কিছুই নয়, ভারতবর্ষের স্বাধীনতা লাভ। আর্থিক দিক থেকে এতে ভারতবর্ষের সুবিধা হয়েছে বলতে হয়। কেননা বিদেশী এই বহিরাগতরা (প্রধানত ইংরেজ) আসতেন নানা ব্যবসাবাণিজ্য এবং সরকারী চাকুরি উপলক্ষ করে। যে বয়সটায় উপার্জন করা যায়, সেই বয়সটুকু থাকতেন এবং উপার্জনের টাকা সবখানিই প্রায় স্বদেশে নিয়ে যেতেন। লক্ষাধিক এই বিদেশীর সংখ্যা পশ্চিম বাঙলায় কমে এখন ১৯৫১ সালে ২৬ হাজারের কোঠায় নেমে

এসেছে। এতে আন্দাজ করা যায় জাতীয় অর্থের যতটা বাইরে চলে যেত তার অংশ কিছুটা কমেছে। কিন্তু এ থেকে যদি আমরা অতি উৎফুল্ল হই, তবে ভুল হবে। ঠিকই যে দার্জিলিঙ-জলপাইগুড়ি থেকে বিদেশীর সংখ্যা হ্রাস পেয়েছে সবচেয়ে বেশী। এটি আসলে চা-বাগান এলাকা। চা-বাগানের বেশ কিছুটা অংশ যে ভারতীয়দের হাতে এসেছে এটা তারই একটা লক্ষণ। কিন্তু হাওড়া হুগলী কলকাতা ২৪ পরগনা মিলিয়ে বিদেশীর সংখ্যা কমে নি বরং একটু বেড়েছে। এই এলাকাটা হল চটকল, ইঞ্জিনিয়ারিং প্রভৃতি ব্রিটিশ কলকারখানা এবং ব্যবসা-বাণিজ্যেরও এলাকা। বোঝা যায় ব্যবসা-বাণিজ্য ও চটকল প্রভৃতি কয়েকটি শিল্পে বিদেশীদের প্রভাব এখনো অক্ষুণ্ণ। বর্ধমান জেলাতেও এ সংখ্যা বিশেষ কমে নি। মনে রাখা দরকার বর্ধমানের মধ্যেই পড়ে কয়লাখনির এলাকাটা। অর্থাৎ, সব মিলিয়ে দেখা যাবে, বিদেশীর সংখ্যা, ইংরেজ আমলের তুলনায় অনেক কমে গেলেও আমাদের অর্থনীতির বড়ো বড়ো জায়গাগুলোতে তাদের প্রভাব, এমনকি সংখ্যা, এমন কিছু ক্ষুণ্ণ হয় নি। এখনো বিদেশী স্বার্থের প্রশ্নটা বাঙলার পক্ষে একটা মস্ত প্রশ্ন।

বাঙলাদেশ দ্বিখণ্ডিত হওয়ার ফলে সংখ্যার দিক থেকে আরো এক শ্রেণীর বিদেশীর হিসেব করা অনিবার্য হয়ে দাঁড়ায়। এঁরা হলেন পাকিস্তানী। পাকিস্তান থেকে যাঁরা এসেছেন তাঁরা সকলেই অবশ্য পাকিস্তানী নন ; এর মধ্যে বিপুল অংশ এসেছেন উদ্‌বাস্তু হয়ে, ভারতের নাগরিক হবার জন্যে। ১৯৫১ সালের গণনায় তাঁদের সংখ্যা প্রায় ২১ লক্ষ। এ ছাড়া আছেন এমন লোক যাঁদের জন্ম বর্তমানের পাকিস্তানে হলেও ভারতীয় নাগরিক

হিসাবেই যাঁরা পরিচিত। এঁদের সংখ্যা প্রায় ২½ লক্ষ। এ বাদে ২ লক্ষ ৬৭ হাজার হলেন পাকিস্তানী নাগরিক। উপার্জনক্ষম বয়সে তাঁরা পশ্চিমবঙ্গে এসেছেন, পরে পাকিস্তানেই ফিরে যাবেন। পাকিস্তানী বহিরাগতদের এই বিপুল সংখ্যা দেখে অনেকে হয়তো চমকে যাবেন। ভাববেন, পশ্চিমবঙ্গের আয় থেকে একটা অংশ এঁদের হাত দিয়ে বাইরে চলে যাচ্ছে। কিন্তু তার চেয়েও চমকাবার কথা আর-একটা আছে : এই মুহূর্তে যদি এই ২½ লক্ষ পাকিস্তানী পশ্চিম বাঙলা ছেড়ে চলে যান তা হলে এ রাজ্যের জাহাজ, স্টীমার প্রভৃতি কয়েকটি ব্যবস্থা একেবারে অচল হয়ে পড়বে।

এর কারণ স্পষ্ট। বাঙলার অর্থনৈতিক জীবন এতদিন ধরে সমগ্রভাবেই গড়ে উঠেছে। তার পিছনে যেমন আছে পশ্চিম-বঙ্গবাসীর দান, তেমনি আছে পূর্ববঙ্গবাসীর দান। হঠাৎ দেশ-বিভাগের পর দেখা গেল এই সমগ্রতা দুখানা হয়েছে। তাতে এক-এক খণ্ড পৃথক রাষ্ট্ররূপে থাকতে বাধ্য হলেও পৃথক ভাবে বাঁচা সম্ভব নয়। পশ্চিম বাঙলার কয়লা, কাপড় প্রভৃতি অনেক জিনিস যদি পূর্ব বাঙলায় না যায় তাহলে ওখানকার মানুষের জীবনযাত্রা খুবই কষ্টকর হয়ে পড়বে। তেমনি পূর্ব বাঙলার কিছু কৃষিসম্পদ যদি এখানে না আসে, তাহলে এখানকার জীবনেও মুশকিল ঘটবে। তাছাড়া এখানকার জাহাজের কাজ, স্টীমারের কাজ, দপ্তরির কাজ প্রভৃতি নানা বৃত্তিতে এতদিন পর্যন্ত পূর্ববঙ্গের লোকেরাই একচেটিয়া ভাবে দক্ষতা অর্জন করে এসেছেন। তাঁদের বাদ দিলে এসব শিল্প চলবেই না। সেই জন্যে, পশ্চিম বঙ্গে পাকিস্তানীদের এই বিপুল সংখ্যা দেখে উভয় দেশের রাষ্ট্রনেতাদের

ভাবা দরকার, কিভাবে বাধা সৃষ্টি না করে, কোনো রকম বর্জন-নীতি অথবা চাপের নীতি অবলম্বন না করে উভয়ের মধ্যে সবরকমের যোগাযোগ বাড়িয়ে তোলা যায়।

অভারতীয় বহিরাগত বলতে আর যাঁরা বাকি রইলেন, তাঁরা নেপাল-সিকিমের লোক। পাকিস্তানীদের মতো এঁরাও পশ্চিম বাঙলার কয়েকটি বিশেষ বৃত্তি অবলম্বন করেই এখানে এসে থাকেন, পুলিসবিভাগ, দরোয়ান-চৌকিদারের কাজ এবং চা-বাগান। মাতৃভাষা নেপালী এমন লোকের সংখ্যা পশ্চিম বাঙলায় প্রায় পৌনে দুই লক্ষ। এঁদের মধ্যে এক লক্ষই এখানে জন্মেছেন। অর্থাৎ পশ্চিমবঙ্গে থেকে যাবার ঝোঁক এঁদের মধ্যে বেশী। নেপালের নাগরিক বলে যাঁরা নিজেদের পরিচয় দিয়েছেন এমন লোকের সংখ্যা, ১৯৫১ সালের গণনা অনুসারে, মাত্র ১৪,৬১৭।

● বাঙলায় অবাঙালী

রাষ্ট্রের হিসাবে যাঁরা বিদেশী এমন লোকেদের কথা বাদ দিয়ে এবার রাষ্ট্রের হিসাবে যাঁরা ভারতীয় অথচ বাঙালী নন এমন লোকেদের কথা ধরা যাক। চলতি কথায় তাঁদের অবাঙালী বলা যাক। ১৯৫১ সালে এই অবাঙালী আগন্তুকদের সংখ্যা পশ্চিম বাঙলায় ছিল ১৮ লক্ষ ৮৯ হাজার। ১৯২১ সালে এই সংখ্যা ছিল ১৩ লক্ষ ৩৪ হাজার। অর্থাৎ ৩০ বছরে অবাঙালীদের সংখ্যা বেড়েছে পাঁচ লক্ষ। অর্থাৎ প্রতি বছরে সওয়া আঠারো হাজার করে অতিরিক্ত অবাঙালী এ রাজ্যে আসছেন,—মাসে দেড় হাজার।

শুধু কলকাতার হিসাব ধরলে এই আগমনের হার অনেক বেশী হবে। ১৯২১ থেকে ১৯৫১ এই তিরিশ বছরে কলকাতায়

অবাঙালী আগমনের হার হয়েছে দ্বিগুণ। পশ্চিম বাঙলায় নতুন আর-একটা কলকারখানার এলাকা গড়ে উঠছে আসানসোল অঞ্চলে। তিরিশ বছরে এই এলাকাতে অবাঙালীর আগমন আরো বেশী—আড়াই গুণ।

পশ্চিম বাঙলার মোট জনসংখ্যার প্রতি একশ জনে ৬'৩ জন হলেন অবাঙালী। কলকাতার অধিবাসীদের প্রতি একশ জনে সাড়ে চব্বিশজন অবাঙালী। আরো সহজ করে বললে দাঁড়ায়, পশ্চিম বাঙলায় প্রতি ১৬ জন লোকের মধ্যে একজন হলেন অবাঙালী, কলকাতায় প্রতি চার জনের মধ্যে একজন হলেন অবাঙালী।

কলকারখানার যত বৃদ্ধি হতে থাকবে, জীবিকার উপায় যত খুলতে থাকবে, ততই এক জায়গা থেকে আর-এক জায়গায় লোক যাতায়াত এবং বসতি স্থাপন বেড়ে যাওয়ার কথা। কিন্তু সেটা হওয়া চাই দুদিক থেকে। এক জায়গায় যেমন একদিক থেকে লোক আসবে, তেমনি সেখান থেকে লোক যাবে অন্যদিকে। তাহলে একটা সুষম উন্নতির অবস্থা ঘটছে বলা যায়। কিন্তু বাঙলা দেশে অবাঙালী আসার পিছনে ঠিক এমনি একটা সুস্থ বিকাশের লক্ষণ তেমন স্পষ্ট নয়। বাঙলাদেশের বাইরে থেকে কত লোক এখানে আসেন এবং কত বাঙালী বাঙলাদেশের বাইরে চলে যান তার একটা হিসাব বইয়ের শেষে পরিশিষ্টে দেওয়া হল।

তালিকা থেকে দেখা যাবে বিহার, উত্তর প্রদেশ, উড়িষ্যা, রাজ-স্থান, মাদ্রাজ, পাঞ্জাব, মধ্যভারত প্রভৃতি রাজ্য থেকে যে পরিমাণ অবাঙালী বাঙলায় আসেন তার চেয়ে ঢের কম বাঙালী বাঙলা ছেড়ে ঐ সব দেশে গিয়ে বসবাস করতে যান। পাশের পাতায় ছবি এঁকে এই গমনাগমনের তুলনাটা আরো ফুটিয়ে তোলা হয়েছে।

এতে বোঝা যায় বাঙলা দেশে অন্যান্য প্রদেশের চেয়ে জীবিকার উপায় এখনো বেশী। কিন্তু তাতে খুশির বিশেষ কারণ
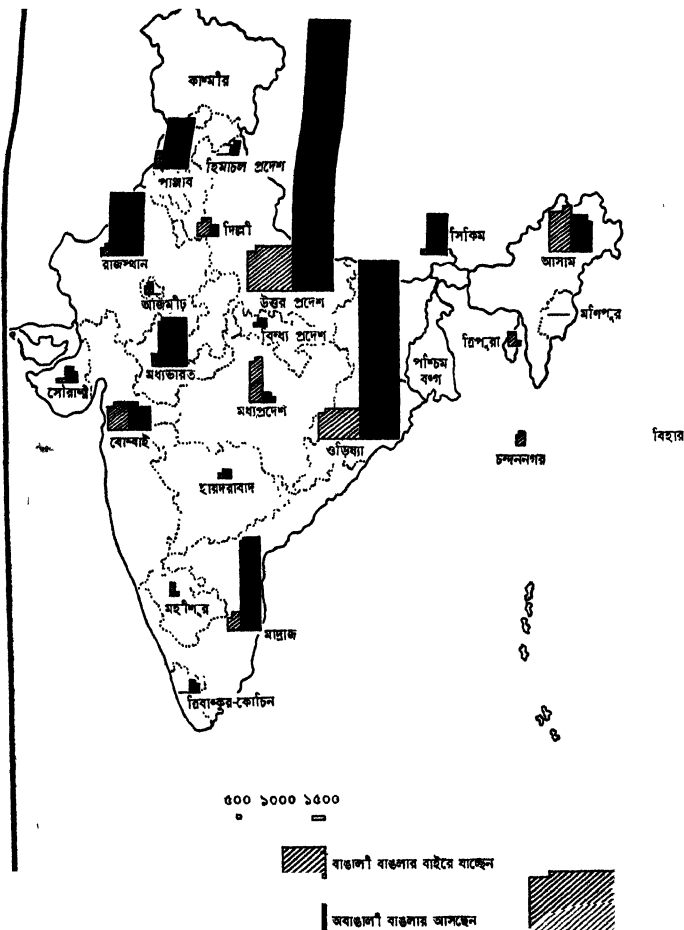
বিভিন্ন প্রদেশ থেকে কি পরিমাণ লোক বাঙলায় আসেন এবং সেই সেই প্রদেশে কি পরিমাণ বাঙালী গিয়ে থাকেন তার তুলনা

নেই। কারণ এই বহিরাগতদের বয়সের একটা হিসাব নিয়ে দেখা গেছে, তাঁদের অধিকাংশেরই বয়স হল ১৫—৫৪ বছরের মধ্যে। এই বয়সটাই হল আসলে কাজ করার এবং উপার্জনের বয়স। বাঙলার মোট অধিবাসীদের মধ্যে এই বয়সের লোক আছেন শতকরা ৫৭·৪ জন। কিন্তু এই অবাঙালী বহিরাগতদের মধ্যে তার হার হল ৭৯%। কলকাতার বড়বাজারে এই হার তো আরো বেশী—৯৭%। এর একটা মানে আছে। বহিরাগত অবাঙালীরা এখানে আসেন বসতি করার জন্যে নয়, উপার্জন করার জন্যে। যে বয়সটায় উপার্জন করা সম্ভব, সেই বয়সটুকুই তাঁরা এখানে থাকেন। তারপর আবার অধিকাংশই ফিরে যান নিজ নিজ প্রদেশে। এখানে উপার্জিত অর্থের একটা বড়ো অংশ তাই পশ্চিম বাঙলার অভ্যন্তরে ব্যয় হয় না। তাতে পশ্চিম বাঙলার লাভ হয় না।

● অবাঙালীদের কর্মক্ষেত্র

মোট যে পরিমাণ অবাঙালী বাঙলাদেশে আসেন তাঁদের বেশীর ভাগ অংশটাই যান এমন সব কাজের মধ্যে যা কৃষিকাজ নয়। চাষ-আবাদে যাঁরা আসেন তাঁদের সংখ্যা নগণ্য। কৃষি অঞ্চলে বহিরাগতদের অনুপাত থেকেই তা বোঝা যাবে—মাত্র ০·৬ ভাগ। কৃষি অঞ্চলের মাঝে মাঝে যে সব শহর আছে তাতে এ হার একটু বেশী হলেও মাত্র ৯·০ । অথচ কলকারখানা এলাকায় এ হার ভয়ানক বেশী। অকৃষি উপজীবিকার মোট ছয় ভাগের এক ভাগ লোকই হলেন অবাঙালী বহিরাগত। কলকারখানা এলাকা এবং চা-বাগান এলাকায় এ হার আরো বেশী—পাঁচ ভাগের এক ভাগ।

এ হিসাব হল উপজীবিকায় নিযুক্ত লোকদের হিসাব। মোট জনসংখ্যার অনুপাত ধরলে তা কমবে—শতকরা ১১ জন। কিন্তু তা থেকে আরো একটা জিনিসই বেরিয়ে আসে—মোট জনসংখ্যার শতকরা এগারো জন হয়েও উপজীবিকায় তাঁদের হার উঁচু—শতকরা কুড়ি।

চাষ-আবাদের কাজে এবং চাষ-আবাদের এলাকায় বহিরাগতদের সংখ্যা কম হলেও একটা জিনিস মনে রাখা দরকার: জমির মালিক হিসাবে তাঁদের গুরুত্ব কম নয়। কলকারখানা এলাকায় দামী দামী অনেক জমি এখন অবাঙালী মালিকদের হাতে গিয়ে জমেছে।

মফস্বল জেলাতেও জমি হাতছাড়া হয়ে মহাজনদের হাতে জমতে দেখা যায়। বাঁকুড়া, নদীয়া, মুর্শিদাবাদ, মালদহ প্রভৃতি জেলায় এই মহাজনদের একটা অংশ হলেন অবাঙালী। তাঁরা ব্যবসা, আড়তদারি প্রভৃতি অবলম্বন করে গ্রামাঞ্চলে এসেছিলেন। ব্যবসার সঙ্গে ঋণ ও মহাজনির কারবারও চালিয়ে থাকেন। এরই পরিণতি-রূপে শেষ পর্যন্ত বেশ কিছু জমি তাঁদের কুক্ষিগত হয়ে পড়ে।

জমিদারির ক্ষেত্রেও অবাঙালীদের স্থান কম নয়। বীরভূমে, বাঁকুড়ায় কয়েকজন অবাঙালী জমিদার আছেন। মুর্শিদাবাদে, মালদহে তাঁদের সংখ্যা অনেক বেশী। জিয়াগঞ্জে, আজিমগঞ্জে আছেন রাজস্থানী জমিদার। আর জলপাইগুড়ি, দার্জিলিঙ জেলায় মোট জমিদারির পাঁচ ভাগের এক ভাগই হল অবাঙালীর দখলে।

এই তো গেল গ্রামাঞ্চল এবং জমিসংক্রান্ত উপজীবিকার কথা। অকৃষি উপজীবিকার ক্ষেত্রে অবাঙালীদের প্রভুত্ব ও গুরুত্ব বিশেষ ভাবনার কথা। সংখ্যার হিসাব নিলে দেখা যাবে পশ্চিম বাঙলায়

অকৃষি উপজীবিকায় যত লোক নিযুক্ত আছেন, তাঁদের ছয় ভাগের এক ভাগই হলেন অবাঙালী ভারতীয়। কলকারখানা ও চা-বাগানের কাজে যত লোক আছেন তাঁদের এক-পঞ্চমাংশ হলেন এঁরা। শিল্পাঞ্চলে যে সব শহর আছে সেখানে লোকসংখ্যার চার ভাগের এক ভাগই এসেছেন বাঙলার বাইরেকার প্রদেশ থেকে। যে সব কলকারখানা থেকে কিছু না কিছু উৎপাদন করা হয় সেখানে পাঁচ ভাগের এক ভাগ এঁরা। ট্রাম, বাস, রেল, ট্রাক, প্রভৃতি যে সব ব্যবস্থাকে পরিবহন বৃত্তি বলা হয়, সেখানে কর্মীদের তিন ভাগের এক ভাগের চেয়েও বেশী এঁদের সংখ্যা।

এই সংখ্যার মধ্যে দুটি ভাগ করা উচিত। যেমন একদল হলেন সাধারণ কর্মী সাধারণ মজুর। সংখ্যার দিক থেকে তাঁরাই বেশী। আর একদল হলেন মালিক-শ্রেণীভুক্ত। সংখ্যার দিক থেকে এঁরা অবশ্যই অনেক কম, কিন্তু আর্থিক দিক থেকে প্রভুত্ব তাঁদের অনেক বেশী। উপরে যে সব সংখ্যা দেওয়া হয়েছে তার মধ্যে এই দুই ভাগই ধরা হয়েছে। এর মধ্যে প্রথম ভাগ, অর্থাৎ যাঁরা এ সব কাজে নিযুক্ত আছেন মাত্র মজুর বা কর্মী হিসাবে, তাঁদের দিকটাও একটু খুঁটিয়ে দেখা ভালো। তাহলে দেখা যাবে পশ্চিম বাঙলার শিল্প গড়ে তোলার ব্যাপারে এঁদের খুব বড়ো একটা দান আছে। এই মুহূর্তে এঁদের যদি বাদ দেওয়া যায় তাহলে পশ্চিম বাঙলার শিল্পও অচল হয়ে পড়বে। ভবিষ্যতে যদি শিল্প গড়ে তুলতে হয়, তাহলেও এঁদের অব্যাহত নিয়োগ প্রয়োজন।

১৯৫১ সালের সেন্সাসে যে সব তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে তা থেকে দেখা যায় এই বহিরাগতের দুই-তৃতীয়াংশের বেশী লোক

আসেন প্রধানত এই কটি জেলা থেকে : বিহারের পাটনা, গয়া, সাহাবাদ, মুঙ্গের, সারণ, মজফ্‌ফরপুর, দ্বারভাঙা ; উত্তর প্রদেশের বালিয়া, গাজীপুর, বানারস, আজমগঞ্জ, জৌনপুর ; উড়িষ্যার কটক, বালেশ্বর, পুরী।

এই সবকটি জেলাই হল প্রধানত কৃষিনির্ভর জেলা। চাষের উপরেই তাদের ভরসা। কলকারখানা বিশেষ নেই। কিন্তু এদেশের চাষের অবস্থা যে রকম সঙীন, জমির উপর লোকের চাপ এত বেশী, জমিদারি ব্যবস্থার কুফল এখনো এত চেপে আছে যে এই সব জেলা থেকে বিপুল সংখ্যায় ভূমিহীন চাষী, কৃষি থেকে ভরণপোষণ হচ্ছে না এমন সব লোক দলে দলে পশ্চিম বাঙলার শিল্পাঞ্চলের দিকে এসে ভিড় করেন। বাঙলার কৃষিও এমন দুরবস্থায় যে কৃষিতে তাঁদের একটুও জায়গা হয় না, যা জায়গা হয় সে ওই কলকারখানায়।

এর মধ্যে প্রদেশ হিসেবে এক-এক রকমের কাজে এক-এক দলের ক্ষমতা বেশী দেখা যায়। পূর্বপাকিস্তানের লোকেরা যেমন জাহাজের কাজে আসেন বেশী, তেমনি উড়িষ্যা থেকে যাঁরা আসেন তাঁরা বেশীর ভাগ মামুলী মেহনতের কাজে লাগেন। তাছাড়া জনস্বাস্থ্য, প্লাম্বিং, আর বিদ্যুৎ-সংক্রান্ত কাজও তাঁদের প্রায় একচেটিয়া। বিহারের উৎসন্ন চাষীরা লাগেন বেশীর ভাগই কুলি-কামিনের কাজে এবং চটকল প্রভৃতি শিল্পে। দক্ষিণ প্রদেশগুলি থেকে যাঁরা আসেন তাঁদের স্থান বেশীর ভাগ চটকলে এবং কয়েকটি রেলকেন্দ্রে।

হয়তো ভবিষ্যতে উত্তর প্রদেশ, বিহার, উড়িষ্যায় ভূমিসমস্যার একটা সমাধান করা গেলে এবং এই সব জায়গায় শিল্পোন্নয়ন

ঘটলে এই ধরনের অস্বাভাবিক একতরফা আগমন কমে উভয় দিকেই কর্মী ও মজুরদের স্বাভাবিক চলাচল বৃদ্ধি পেতে পারবে।

কিন্তু এই সাধারণ ভূমিহীন কর্মপ্রার্থীদের সমস্যা ছাড়াও আরো একটি সমস্যা আছে: সেটি হল অবাঙালী মালিকানার সমস্যা। সংখ্যার দিক থেকে তাঁদের অনুপাত নিতান্ত কম হলেও দেখা যাবে, পশ্চিম বাঙলার শিল্পে ব্রিটিশ মালিকদের পরেই অধিকাংশ ক্ষেত্রে এক-একটা একচেটিয়া মালিকানা গড়ে উঠেছে। তাঁদের অনেকেই অবাঙালী, প্রধানত মাড়োয়ারী এবং গুজরাতী।

এমনকি সংখ্যার হিসাবেও যে এই অবাঙালী মালিকানা একেবারে নগণ্য নয় তা বোঝা যাবে পশ্চিম বাঙলার ব্যবসার দিকে তাকালে। পশ্চিম বাঙলার ব্যবসায়ের কাজে যত লোক আছেন তাঁদের ছয় ভাগের এক ভাগই হলেন অবাঙালী।

বহিরাগতের সংখ্যাধিক্যের ফলে, আর্থিক সমস্যা ছাড়াও আরো একটি সমস্যা মনে রাখা দরকার—নৈতিক সমস্যা। দেখা গেছে বহিরাগতদের মধ্যে পুরুষের সংখ্যা যত বেশী, নারীর সংখ্যা তত কম। বাঙলায় প্রতি হাজার পুরুষে মেয়ের সংখ্যা ৯২০। অথচ আসাম, উড়িষ্যা, বিহার থেকে আসা বহিরাগতদের মধ্যে এ অনুপাত হল প্রতি হাজার পুরুষে মাত্র ৪২৬ জন মেয়ে। এত যে কম মেয়ে আসে তার কারণ স্পষ্ট। বহিরাগত যাঁরা আসেন, তাঁরা তো আর স্থায়ীভাবে বসবাস করতে আসেন না। যেখানে জীবন কাটবে না বলে জানাই আছে সেখানে কেই-বা স্ত্রীকন্যা-সমেত আসতে চান? তাই ছেলে মেয়ে বৌ থাকে দেশে। এখানে আসেন শুধু পরিবারের উপার্জনক্ষম লোকটি। বিহার

রাজ্যে নারী-পুরুষের অনুপাত সমান সমান। কিন্তু সেই বিহার থেকে যাঁরা বাঙলায় আসেন তাঁদের মধ্যে নারী মাত্র পাঁচ আনা রকমের। উড়িষ্যা রাজ্যে নারীর সংখ্যা পুরুষের বেশী। কিন্তু এখানে যে ওড়িয়ারা আসেন, তাঁদের মধ্যে নারীর সংখ্যা বিহারীদের চেয়েও কম।

এই বৈষম্যের একটা নৈতিক কুফল না হয়ে পারে না। ঘর-সংসার ছেড়ে থাকতে বাধ্য হওয়ার ফলে নৈতিক চরিত্রের আবহাওয়া দূষিত হতে থাকে। কর্মের প্রেরণাও বিশৃঙ্খল হতে বাধ্য। বড়ো বড়ো শহরে এবং শিল্পাঞ্চলে নৈতিক মান কলুষিত হওয়ার পক্ষে এটি প্রধান না হলেও উল্লেখযোগ্য একটি ঘটনা। অবাঙালী বহিরাগতদের সম্পর্কে অশোক মিত্র-প্রণীত 'আমার দেশ'-এ এই রকম কয়েকটি সিদ্ধান্ত করা হয়েছে :—

(১) কৃষিক্ষেত্র থেকে বিতাড়িত জনগণ কাজের সন্ধানে বাঙলার কৃষিক্ষেত্রে না গিয়ে শিল্পাঞ্চলে আসছে। কারণ কৃষি-ক্ষেত্রে লোকধারণের ক্ষমতা নিঃশেষ হয়ে গেছে।

(২) ভারতীয় অধিবাসীদের অধিকাংশই পশ্চিমবঙ্গের অস্থায়ী অধিবাসী। এই রাজ্য তাঁদের অর্থোপার্জনের ক্ষেত্র, তাঁদের অর্জিত অর্থে পশ্চিমবঙ্গ তত লাভবান হয় না, তাঁদের নিজ নিজ রাজ্যেরই শ্রীবৃদ্ধি ঘটে।

(৩) পশ্চিমবঙ্গের শিল্প ও বাণিজ্য প্রধানত বহিরাগতদের সৃষ্টি। তাঁরাই এটা চালু রেখেছেন।

● জন্ম-মৃত্যু

যাওয়া-আসা ছাড়াও পশ্চিম বাঙলার জনসঙ্গমের প্রকৃতিটা বুঝতে হলে আরো একটা জিনিস দেখতে হবে,—জন্ম কেমন, মৃত্যু কত। একটা দেশের জনসমষ্টিকে তুলনা করা যেতে পারে একটা হ্রদের সঙ্গে। তার মধ্যে কিছু নদী এসে পড়েছে, কিছু নদীর আবার উৎপত্তিও হয়েছে সেখান থেকে। সারা বছর ধরে তার বুক থেকে জল শুষে নিচ্ছে রোদ্দুর। আবার নতুন জলের যোগান ঘটছে বর্ষার মেঘ থেকে, মাটির তলাকার প্রস্রবণ থেকে। যে নদীনালাগুলো এই হ্রদে এসে জল ঢালছে তারা যেন বহিরাগত। যারা নতুন স্রোত কেটে বেরিয়ে যাচ্ছে তারা প্রবাসী বাঙালী। যে জল শুষে নিচ্ছে আকাশ, সেটা মৃত্যু। যে নতুন জলের যোগান ঘটছে মাটির নিচু থেকে, বর্ষার মেঘ থেকে সেটা জন্ম। পশ্চিম বাঙলার মোট জনসঙ্গমের হিসাবে যাওয়ার আগে তাই জন্মমৃত্যুর এই ধারাটা পরখ করে দেখা ভালো।

কিন্তু তাতে একটা মুশকিল আছে। আমাদের দেশে জন্ম-মৃত্যুর হিসেবে বড়ো গলদ থেকে গেছে। ছেলে হলেই তার সংবাদ দাখিল করার দায়িত্ব অন্যান্য দেশে ছেলের বাপ-মায়ের উপর দেওয়া আছে। এটি অবশ্য কর্তব্য। কিন্তু এখানে তেমন কোনো রেওয়াজ নেই। গাঁয়ের চৌকিদারের উপরই সে ভার ছেড়ে দেওয়া। সে যা বোঝে করে। মৃত্যুর হিসেব রাখা সম্পর্কেও প্রায় একই ব্যাপার। এই সব অসম্পূর্ণ তথ্য থেকেই জন্মমৃত্যুর সম্পর্কে আমাদের যা কিছু জ্ঞান আহরণ করতে হবে।

যাই হোক, জনসংখ্যার তত্ত্ব নিয়ে যাঁরা আলোচনা করেন তাঁরা এই থেকেই গণিতের এক জটিল নিয়ম থেকে জন্মমৃত্যুর হার স্থির করেছেন। এ হার একেবারে সঠিক এমন দাবি তাঁরাও করেন না। তবে আসল হারের সঙ্গে এ হারের খুব একটা তফাত ঘটবে তাও নয়। এই রকম একটা হিসেব করেছিলেন ১৯১১ সালে অকল্যাণ্ড সাহেব। তাঁর হিসেবে তখন বাঙলায় জন্মের হার ছিল ৪৬.৭। ১৯২১ সালে সেন্‌সাস্‌-অধিকর্তা টম্‌সন্‌ সাহেবের মতে সে হার ছিল ৪৩.৫। ১৯২১-৩০ দশকে জন্মের গড় হার পোর্টার সাহেবের মতে ৪১.৯৫ এবং মৃত্যুর হার ৩৪.৯৪। ১৯৪১-৫০ সালের হিসেবে নানা দিক থেকে চিন্তার পর পশ্চিম বাঙলায় জন্মের গড় হার ধরা হয়েছে ৪১/৪২এর মতো।

দেখা যাচ্ছে, বিভিন্ন অনুসন্ধান থেকে পাওয়া হিসেবগুলি কিন্তু খুবই কাছাকাছি, ৪০ থেকে ৪৭এর মধ্যে। এ থেকে অনায়াসে বলা যায় তাহলে জন্মের হার এখানে ৪০এর কম অন্তত নয়। জন্মের এই হার কিন্তু পৃথিবীর অন্য নানা দেশের তুলনায় ভয়ানক বেশী, এত বেশী যে প্রথম হিসেবে চমকে যাবার কথা।

বাঙলায় যেখানে জন্মের হার ৪০ সেখানে ১৯৩৭ সালের হিসেবে ভিয়েনা নগরীতে জন্মের হার ছিল মাত্র ৫'৪। ১৯৩৪ সালে প্যারিসে এ হার ছিল মাত্র ১২'৩, লণ্ডনে ১৩'৪; ১৯৩৮-৪০ সালে নিউইয়র্কে এ হার ছিল মাত্র ১৩'৬। এ দেশের উপর মা ষষ্ঠীর কৃপা অফুরন্ত।

জন্মের হার কিন্তু ক্রমাগত বেড়ে যাবে এমন হয় না। একটা বিশেষ সীমার পর তা থমকে যাওয়াই বেশী সম্ভব। সে হিসেবে পশ্চিম বাঙলায় জন্মের হার এখনি এত বেশী যে ভবিষ্যতে আর খুব বেশী বাড়ার সম্ভাবনা কম।

আমাদের জনসংখ্যা বৃদ্ধির তাই একটি পথ খোলা—মৃত্যুর হার যদি কমে।

কিন্তু জন্মের হার দেখে যদি আমরা খুশী হই, তবে সমান স্তম্ভিত হতে হবে মৃত্যুর হার দেখে। অন্য কোনো সভ্য দেশে এই পরিমাণ মৃত্যুর হারও প্রায় কল্পনাতীত। শুধু শিশুমৃত্যুর চেহারা দেখলেই কান্না পাবে। ১৯০১ থেকে ১৯১১ সাল—এই দশকে এই হার ছিল হাজারকরা ২০৭'২টি পুরুষ-শিশু এবং ১৮৮'০টি নারী-শিশু। ১৯১১-২১ দশকে এ হার যথাক্রমে ২১৬'৬৭টি ছেলে এবং ২০২'০টি মেয়ে। ১৯৩০ সাল পর্যন্ত শিশু-মৃত্যুর হার প্রায় একই রকম—হাজারকরা ২৫০টি।

শুধু শিশুমৃত্যুর হার না ধরে সমগ্রভাবে মৃত্যুর হার বিচার করতে গেলেও কিছুটা আনুমানিক হিসাবের শরণ নিতে হয়। জন্মের মতো এ ক্ষেত্রেও নিশ্চিত করে কিছু বলার উপায় নেই। পোর্টারের হিসাবমতে ১৯৩১-৪০ সালে এ হার ধরা হয়েছিল হাজারকরা প্রায় ৩৫টি। ১৯৪১-৫০ সালে সম্ভবত তা কমে হয়েছে ২৮/২৯।

নীচে আমরা বিভিন্ন দশকে পশ্চিম বাঙলায় জন্মমৃত্যুর একটি হিসাব তুলে দিচ্ছি। যে সব জন্ম ও মৃত্যু লিপিবদ্ধ হয়েছে, অর্থাৎ রেকর্ড করানো হয়েছে এ হিসাব তার ভিত্তিতেই।

১৯৪১-৫০ দশক

	বর্ধমান বিভাগ	প্রেসিডেন্সি বিভাগ	পশ্চিম বাঙলা
মৃত্যু	২২০,৬৯,২৫৯	২২,২২,৯৬২	৪২,৯২,২২১
জন্ম	২৩,৪৬,৭৬৬	২৩,০৬,৫৯৩	৪৬,৪৭,৩৫৯

১৯৩১-৪০ দশক

	বর্ধমান বিভাগ	প্রেসিডেন্সি বিভাগ	পশ্চিম বাঙলা
মৃত্যু	১৯,৭০,৯৮৭	২০,২৬,০০১	৩৯,০৬,৯৮৮
জন্ম	২৬,২৯,০১৪	২৬,২৭,৬৭১	৫২,৫৬,৬৮৫

১৯২১-৩০ দশক

	বর্ধমান বিভাগ	প্রেসিডেন্সি বিভাগ	পশ্চিম বাঙলা
মৃত্যু	২০,৬৭,৫৪৮	২২,১৯,৬৮৮	৪২,৮৭,২৩৬
জন্ম	২৪,১৩,২৫৫	২৩,০০,৮০১	৪৭,১৪,০৫৬

জন্মমৃত্যুর এই সব তথ্য থেকে বাঙালীর প্রাণ-শক্তির একটা ধারণা করা যায়। রেমণ্ড পার্ল সাহেবের মতে জন্মের হারকে যদি মৃত্যুর হার দিয়ে ভাগ করা যায় তবে যে সংখ্যাটা পাওয়া যাবে সেইটে হল একটা জাতের ভাইট্যাল ইন্‌ডেক্‌স্। তা থেকে বোঝা যাবে জাতটা বাড়ছে না ক্ষইছে, বাঁচছে না মরছে। এই সংখ্যা ১০০ থেকে যত কমবে তত ক্ষয়ের লক্ষণ, যত বাড়বে তত বৃদ্ধির প্রমাণ। নীচে পশ্চিম বাঙলার এই ভাইট্যাল ইন্‌ডেক্‌স্ বা প্রাণ-স্বাস্থ্যের একটা তালিকা দেওয়া হল—

প্রতি পাঁচ বছরের হিসাব

১৯০১—১৯০৫	১০৩.৪
১৯০৬—১৯১০	৯৯.৬
১৯১১—১৯১৫	৯৮.৬
১৯১৬—১৯২০	৮৫.৬
১৯২১—১৯২৫	১০৯.২
১৯২৬—১৯৩০	১১৩.২
১৯৩১—১৯৩৫	১২৬.০
১৯৩৬—১৯৪০	১৩৫.৪
১৯৪১—১৯৪৫	১০৪.৮
১৯৪৬—১৯৫০	১২১.৬

প্রতি দশ বছরের হিসাব

১৯০১—১৯১০	১০১.৩
১৯১১—১৯২০	৯২.১
১৯২১—১৯৩০	১১১.২
১৯৩১—১৯৪০	১৩০.৭
১৯৪১—১৯৫০	১১৩.২

এ থেকে দেখা যাচ্ছে ১৯১৬-২০—এই পঞ্চকের সূচক সংখ্যা সবচেয়ে কম। এদেশে ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জা জ্বর প্রথম মহামারী আকারে দেখা দিয়েছিল এই সময়টাতেই। এরপর ১৯২১ থেকে সূচক ক্রমান্বয়ে বেড়ে গেলেও হঠাৎ ১৯৪১-৪৫ সালে আবার একটু নেমেছে। পাঠকদের মনে থাকতে পারে, এই সময়টা হল পঞ্চাশের মন্বন্তরের বছর। যুদ্ধকালীন এই দুর্ভিক্ষে বাঙলায় বিপুল পরিমাণ অনশন-মৃত্যু ঘটলেও এই পঞ্চকে যে তার ফল আরো বেশী

পরিমাণে দেখা যাচ্ছে না, তার কারণ, দুর্ভিক্ষ-মন্বন্তরের ধাক্কাটা বেশী করে পূর্ববঙ্গের উপর দিয়েই গেছে। পাকিস্তানের জন-বিবরণীতে তার সাক্ষ্য মিলবে।

যাই হোক, জন্মমৃত্যুর এই খতিয়ান থেকে দুটি কথা খুব স্পষ্ট হয়ে বেরিয়ে আসে। প্রথমত পশ্চিম বাঙলায় বাঙালীর বেঁচে থাকার রকমটা খুব সঙীন। ১৯২০ সাল পর্যন্ত তো ঝোঁকটা ক্ষয়ের দিকেই। তার পরেও যে বাঁচা সেটাও খুব শক্ত রকমের বাঁচা নয়। যুদ্ধের পর, স্বাধীনতার আমলেও, ভাইট্যাল ইন্‌ডেক্‌সে সূচক মাত্র ১২১'৬। এই সঙীন প্রাণশক্তির উপর যখনই কোনো অতিরিক্ত ধাক্কা আসে—দুর্ভিক্ষ অথবা মহামারী—তখনই লোকে তা আর প্রতিরোধ করতে পারে না।

দ্বিতীয়ত, সূচক সংখ্যা এত কম যে তার বিকাশের সম্ভাবনা বিপুল। বলতে গেলে, এই দিক থেকে বিকাশ এখনো শুরুই হয় নি। সুযোগ-সুবিধার বন্দোবস্ত হলে এই প্রাণশক্তির উন্নতি খুবই হতে পারে।

আরো একটা কথা। ১৯২০ সাল পর্যন্ত এই সূচকের মধ্যে একটা আটকাপড়া ভাব খুব বেশী। বৃদ্ধির পথ যেন খুলছেই না। ১৯২০ সালের পর থেকে কিন্তু বৃদ্ধি অব্যাহত। অন্যান্য কারণ ছাড়াও এর একটা কারণ এই যে রোগ-মহামারী প্রতিরোধের ক্ষমতা আগের তুলনায় বেড়েছে, যদিও সমগ্র সমস্যার কাছে এ সাফল্য নিতান্তই আংশিক।

● লোকসমষ্টি

আগে বলেছি এ দেশটা যেন একটা হ্রদ। তার কিছু জল শুষে যাচ্ছে মৃত্যুতে, কিন্তু জলের যোগান হচ্ছে জন্মে। নদীনালা বেয়ে তাতে এসে পড়ছে বহিরাগত। নদীনালা বেয়ে তা থেকে বেরিয়ে যাচ্ছে প্রবাসী। এই যাওয়া-আসা, জন্মমৃত্যু সব মিলিয়েও হ্রদের একটা বিশেষ চেহারা ফুটে ওঠে। এবার আমরা সেই সব-মেলানো চেহারাটার তল্লাস নেব।

তার মোটমাট হিসেবে দেখা যাবে, পশ্চিম বাঙলায় লোকবৃদ্ধি হয়ে চলেছে ক্রমাগত। আয়তনে এ জায়গাটা বড়ো নয়। ভারতবর্ষের 'ক' শ্রেণীর রাজ্যের মধ্যে এর আসন একেবারে নীচের কোঠায়। কিন্তু লোকসংখ্যার হিসেবে এর জায়গা কিছু উপরের দিকে, পাঁচের কোঠায়। একটা রাজ্যে মোট যত লোক, তাকে যদি মোট এলাকা দিয়ে ভাগ করা যায় তবে যে সংখ্যাটা পাওয়া যাবে সেটাকে বলা যায় বসতির ঘনতা। এই সংখ্যা বেশী হলে বুঝতে হবে, সে দেশে লোক গিজগিজ করছে। কম হলে ধরতে হবে দেশটায় লোক কম। ভারতবর্ষে যত "ক" শ্রেণীর রাজ্য আছে তার মধ্যে পশ্চিমবঙ্গের ঘনতাই হল সবচেয়ে বেশী—প্রতি বর্গমাইলে ৮০৬ জন।

লোকসমষ্টির এই হিসেব ধরতে গিয়ে পশ্চিম বাঙলার পক্ষে বিশেষ করে আর-এক শ্রেণীর মানুষকে গণনা করতে হবে। এঁরা হলেন উদ্‌বাস্তু। আমাদের এই পশ্চিম বাঙলার সৃষ্টি হয়েছে আগেকার বাঙলাকে দু-খণ্ড করে, দুটি আলাদা আলাদা রাষ্ট্রের জন্ম দিয়ে। আগেই বলা হয়েছে এর ফল শুভ হয় নি। উদ্‌বাস্তু সমস্যা এই রকম একটি কুফল। বর্তমান পশ্চিম বাঙলাকে চেনাতে গিয়ে

যেমন বলা যায় এ হল ভাগীরথী নদীর দেশ, তেমনি বলা হয় এ হল উদ্‌বাস্তুর দেশ। ১৯৪৭ সাল থেকেই দলে দলে উদ্‌বাস্তু পূর্ববঙ্গ ছেড়ে এ রাজ্যে প্রবেশ করেছেন এবং এখনো তার স্রোত অব্যাহত। ১৯৫১ সালে যে গণনা হয় তাতে ১৯৪৬ সাল থেকে ১৯৫১ সাল পর্যন্ত মোট ২০,৭১,১০৭ জন উদ্‌বাস্তুকে এ রাজ্যে গণনা করা হয়েছে। তার মধ্যে ১১ লক্ষ হলেন পুরুষ, ৯ লক্ষ নারী। অর্থাৎ এ রাজ্যের মোট জন-সংখ্যার অনুপাতে শতকরা ৮·৫ জনই হলেন উদ্‌বাস্তু। সহজ করে বললে দাঁড়ায়, প্রতি ১২ জন লোকে একজন উদ্‌বাস্তু।

এর আগে যে বহিরাগতদের হিসেব দেওয়া হয়েছিল তার মধ্যে উদ্‌বাস্তুদের ধরা হয় নি। এ সম্পর্কে পরে আরো বিশদভাবে বলার থাকবে। আপাতত উদ্‌বাস্তু বহিরাগত জন্মমৃত্যু সব মিলিয়ে গোটা পশ্চিম বাঙলার লোকসমষ্টি ১৯৫১ সালের হিসাবে ২,৪৮,১০,৩০৮ জন। জেলা হিসেবে এই লোকসংখ্যার একটা ছক পরিশিষ্টে দেওয়া হল।

আয়তন এবং জনসংখ্যা দুদিক থেকে পশ্চিম বাঙলায় প্রথম স্থান ২৪ পরগনা জেলার। তারপর মেদিনীপুরের।

● লোকবৃদ্ধির ধারা—অতীত

দেখা যাচ্ছে পশ্চিম বাঙলায় লোকের সংখ্যা মোটেই কম নয়। যে পরিমাণ জমি তার তুলনায় বরং অনেক বেশী। খুব স্বভাবতই মনে হবে, এই অবস্থাটা কি কেবল আজকেই ঘটল, না কি চিরকালই এখানে লোকের চাপ খুব বেশী?

আধুনিক কালে আমরা যেমন বৈজ্ঞানিক গবেষণা করে লোক-সংখ্যার একটা মোটামুটি হিসেব লিপিবদ্ধ করে রাখতে পারি

আগেকার আমলে তেমন কোনো ব্যবস্থা ছিল না। তবু নানা পরোক্ষ প্রমাণ থেকে আমরা একবার অতীতের দিকে তাকিয়ে দেখতে পারি।

একেবারে আদি যুগের কথা আগেই বলেছি। সংখ্যার কোনো হিসেব সে সময় পাওয়া সম্ভব নয়। তবু পুরাণ প্রভৃতির গল্প থেকে আন্দাজ করা যায়, এ দিকটা তখন নিতান্তই বিরল-বসতি, 'লাঢ় দেশ' তখন প্রায় 'পথহীন'। তারপর থেকে নানাদিক থেকে নানা গোত্রের মানুষ এখানে এসেছে এবং বসতি স্থাপন করেছে। মৌর্য, বিশেষ করে গুপ্ত যুগের সভ্যতার নিদর্শন বাঙলায় বেশ ছড়ানো। তবু তখনো যে অনেক এলাকা ফাঁকা পড়ে ছিল, অনেক বনজঙ্গল কাটতে বাকি ছিল তা আন্দাজ করা যায় পরবর্তী পাল আমলের তাম্রশাসনগুলি থেকে। এগুলি হল আসলে ভূমিদান ও ভূমিবিক্রয়ের একরকমের রাজকীয় দলিল। এই সব তাম্রশাসন থেকে অনুমান করা যায়, তখন এ দেশটার চারিদিকে ক্রমাগত বসতি স্থাপন করা হচ্ছে, নতুন জমি হাসিল করা হচ্ছে। অর্থাৎ তখনো লোক কম, জমি অঢেল। সেন আমলের তাম্রশাসনগুলো থেকে বরং একটু সন্দেহ হয়, এইবার লোক যথেষ্ট বেড়েছে। নতুন জমি পত্তনের বদলে পুরনো জমির উপরেই চাপ পড়তে শুরু করেছে। এই অবস্থাটা ঠিক কি কি ভাবে এগিয়ে এসে বর্তমান রূপ নিয়েছে, তা পুরোপুরি অনুমান করতে যাওয়ার নানা অসুবিধা আছে। তবু ঐতিহাসিক কিছু রচনাদি থেকে আমরা মুঘল আমলের অবস্থার একটা আন্দাজ করতে পারি।—আইন-ই-আকবরিতে দেখা যায় চাষীদের স্বার্থ-পোষণের জন্য নানারকম নির্দেশ আছে। তখন নিয়ম ছিল অন্য

চাষী না পেলে জমি থেকে চাষী উচ্ছেদ করা চলবে না। এ থেকে মনে হয়, জমির তুলনায় লোকের সংখ্যাধিক্য তখনো খুব বেশী হয় নি, যদিও লোকসংখ্যা তখন নিশ্চয়ই আদি যুগগুলোর চেয়ে অনেক বেড়ে গেছে। মুঘল আমলের শেষ দিকেও পশ্চিম বাঙলায় জনবসতি যে বেশ ঘন এমন নানা প্রমাণ পাওয়া যায়।

এর পরেই এল ইংরেজ আমল। এবং ইংরেজ আমলের প্রায় শুরুতেই দেখা দিল কুখ্যাত ছিয়াত্তরের মন্বন্তর (১৭৭০ খ্রীঃ)। হান্‌টার সায়েবের মতে এই মন্বন্তরে তখনকার গোটা বাঙলার তিন ভাগের একভাগ লোকই নিশ্চিহ্ন হয়। চাষের জমি অনাবাদী হয়ে পড়ে প্রায় অর্ধেক। কর্ণওয়ালিশের সময়েও বাঙলার এক-তৃতীয়াংশ জমি অনাবাদী পড়ে ছিল। এ হিসাব সমগ্র হলেও ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের বেশী ধাক্কাটা গেছে প্রধানত বর্তমান পশ্চিম, মধ্য ও উত্তর বাঙলার উপর দিয়ে।

এতদিন পর্যন্ত লোকগণনার কোনো সার্থক নজির ইতিহাসে নেই। ইংরেজ আমল থেকে বিভিন্ন পণ্ডিত বিভিন্ন উপায় অবলম্বন করে আনুমানিক এক-একটা হিসেব তৈরি করতে শুরু করেন। ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের ঠিক পরেই কোলব্রুক্‌ সাহেব যে হিসেব করেন, তাতে বলা হয় বাঙলায় তখন প্রতি বর্গমাইলে ঘনতা ছিল ২০৩ জন। তখনকার সবচেয়ে সমৃদ্ধিশালী জেলা ছিল বর্ধমান, ২৪ পরগনা, নদীয়া। ১৮৭২ সালে এদেশে প্রথম মাথাগুনতি হিসাব হয়। কিন্তু এই মাথাগুনতি হিসেবের আগেও পরোক্ষ নানা দৃষ্টান্ত থেকে জনসমষ্টির ধারা অনুমান করা যেতে পারে। যেমন ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের পরে হয় ১৭৯৩ সালের চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত, ১৮৬৪ সালে গ্রেট্‌ রেন্ট্‌ কেস্‌, ১৮৮৫ সালে প্রজাস্বত্ব

আইন। পর পর এই আইনগুলো খুঁটিয়ে দেখলে বোঝা যায়, ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের পর চাষবাস বিশেষ ছিল না। সে যুগে জমিদারদের দিক থেকেই আগ্রহ ছিল প্রজা বসানোর, জমি চাষ করবে এমন লোকের। কাড়াকাড়ি হত প্রজা নিয়ে। আইনে তার ছাপ পড়েছে। হফতম পঞ্চম রেগুলেশনে বলা হয়েছিল জমিদারের অনুমতি ছাড়া প্রজা অন্য জমিদারের জমি চাষ করতে পারবে না। তখনকার মামলা-মোকদ্দমা থেকেও দেখা যায় প্রায়ই এক জমিদার অন্য জমিদারের প্রজা ভাঙিয়ে আনার চেষ্টা করছেন, এবং তাই নিয়ে মামলা চলছে। এ থেকে আন্দাজ করা যায়, মন্বন্তরের পর প্রথম পর্যায়ে আবার লোক বেড়েছে, কিন্তু জমির তুলনায় লোক তখনো খুব কম। এর পর অবস্থা বদলালো। উনিশ শতকের মাঝামাঝি থেকেই দেখা যাচ্ছে জমিদাররা এখন আর প্রজা খুঁজে বেড়াচ্ছেন না, প্রজার জন্য কাড়াকাড়ি হচ্ছে না। প্রজারাই বরং জমি খুঁজে বেড়াচ্ছে। যাদের জমি ছিল জমিদাররা তাদের উচ্ছেদ করে বেশী খাজনায় নতুন প্রজাকে বিলি করতে শুরু করেছেন। জমির তুলনায় প্রজার সংখ্যা যখন কম ছিল তখন জমিদারদেরই গরজ ছিল প্রজা ধরে রাখার। জমির তুলনায় প্রজার সংখ্যা যখন বেশী, তখন প্রজাদেরই গরজ বেশী খাজনা দিয়েও জমি পাওয়ার।

মোট কথা, ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের লোকক্ষয়ের পর মোটামুটি ১৮২৫-৩৫ সাল নাগাদ এদেশে লোকসংখ্যা একটা সমতায় এসে পৌঁছেছে। এবং তারপর থেকে এই শতাব্দীর গোড়া পর্যন্ত লোক মোটের উপর বেড়েছে।

কিন্তু মোটের উপর বাড়লেও এ হার সমান ছিল না। বৃদ্ধির হারে জোয়ার-ভাটা খেলেছে ক্রমাগত। উনিশ - শতকের

মাঝামাঝি এদেশে রেলপথের পত্তন হতে শুরু করে। রেলপথের বাঁধ পড়ায় জলনিকাশের যে স্বাভাবিক ব্যবস্থা এখানে ছিল তা বন্ধ হয়ে যায়। তাতে চাষ-আবাদের অবনতি ছাড়াও বাঙলার স্বাস্থ্য একেবারে ধ্বংস পায়। নতুন এক জ্বর, ম্যালেরিয়া, তখন প্রায়-মহামারী হয়ে বাঙলায় আবির্ভূত হয়। তখনকার লেখাপত্রে এই মহামারীর নাম দেওয়া হয়েছিল বর্ধমান-জ্বর। সেই থেকে ম্যালেরিয়া এদেশে স্থায়ী হয়ে বাসা বেঁধেছে এবং এদেশের স্বাস্থ্যের ভয়াবহ অবনতি ঘটিয়েছে।

তাছাড়া অতীতের ভূমিব্যবস্থার সঙ্গে সেচব্যবস্থার একটা অঙ্গাঙ্গী যোগ ছিল। পুরনো রাজা-জমিদাররা সেচব্যবস্থার উন্নতি করতে বাধ্য থাকতেন। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পর থেকে নতুন জমিদারি ব্যবস্থায় এই সেচ-ব্যবস্থার দায়িত্ব আর কারও রইল না। চাষ ক্রমেই বৃষ্টির উপর নির্ভর করতে বাধ্য হল। তাতে জমির উৎপাদনক্ষমতা কমেছে, লোকের আর্থিক দৈন্য বেড়েছে। তার ফলে যে পরিমাণ লোকবৃদ্ধি সম্ভব ছিল তা পদে পদে বাধা পেয়েছে। ফলে—লোক কখনো বেড়েছে, কখনো আবার বর্ধমান-জ্বরের মতো এক-একটা আপাত কারণে কমেছে। এবং সাধারণ ভাবে তার বৃদ্ধি হয়েছে খুব ধীরগতিতে।

● লোকবৃদ্ধি—একালের হিসাব

১৮৭২ সালে প্রথম মাথাগুনতি হিসেব নেওয়া হয়। কিন্তু এই হিসেবও বেশ গলদপূর্ণ বলে মনে করা হয়। ১৮৯১ খ্রীষ্টাব্দ থেকে বর্তমানের পশ্চিমবঙ্গের লোকসংখ্যার একটা হিসেব পাশের পাতায় দেওয়া হল।

১৯২১-কে সীমা ধরে যদি দুই পর্যায়ের লোকবৃদ্ধির মোট হিসাব দেওয়া যায়, তাহলে চমকে যেতে হবে। ১৮৭২ থেকে ১৯২১ এই পঞ্চাশ বছরে লোকসংখ্যা বেড়েছে মোট ২০'৫ শতাংশ। অথচ ১৯২১-৫১ মাত্র এই তিরিশ বছরের মধ্যেই লোক বেড়েছে ৫'১৩ শতাংশ। সেন্‌সাস্ কর্তৃপক্ষ বলছেন, ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের একশ বছর পরেও (১৮৭০) প্রতি জেলায় অকর্ষিত জমির প্রাচুর্য দেখা গেছে। কিন্তু তার ৮০ বছরের মধ্যেই (১৯৫০) লোনা, পাথুরে বা বৃক্ষাচ্ছাদিত ভূমি ছাড়া আর কিছুই বাকি নেই।

১৯২১-এর পর থেকে লোকসংখ্যা বৃদ্ধির এই ব্যাপারটা কেন ঘটল, তার কারণ হিসেবে সেন্‌সাস্ কর্তৃপক্ষ বলছেন, আগের কালে এই পরিমাণ রেলপথ ছিল না। এখন রেলপথ বিস্তারের ফলে যাতায়াতের সুবিধা হয়েছে। তাতে রোগ ও খাদ্যাভাব প্রতিরোধে সরকারের শক্তি বেড়েছে। তাছাড়া, কৃষিজাত পণ্যের জন্য একটা বাজার তৈরী হয়ে গেছে। কৃষিব্যবস্থার আর্থিক মূল্য বেড়েছে। ভূমিহীন খেতমজুররা এক জায়গা থেকে আর-এক জায়গায় গিয়ে টাকা রোজগারের সুবিধা পেয়েছে। মধ্যবিত্ত ভদ্রলোকদের মধ্যে শ্রমের মর্যাদা বেড়েছে। ইত্যাদি।

অবশ্য এ ছাড়াও একটা মূল কারণ হয়তো আছে। ইংরেজ রাজত্বের শুরু থেকে গোটা উনিশ শতকই হল একটা ভাঙনের যুগ। এই শতাব্দী ধরে বাঙলার কুটির-শিল্প সমূলে ধ্বংস হয়েছে, অথচ তার জায়গায় নতুন কিছু গড়ে ওঠে নি। কৃষিব্যবস্থার উপর বৃত্তিহারা মানুষের চাপ বেড়েছে আর বেড়েছে জমিদারদের শোষণ। ভেঙে পড়েছে প্রাচীন সেচব্যবস্থা এবং তার সঙ্গে স্বাভাবিক স্বাস্থ্য-ব্যবস্থা। অর্থনীতির ক্ষেত্রে এই আটকাপড়া ভাবটা আমাদের জন-

সংখ্যাতেও প্রতিফলিত হয়েছে। লোকবৃদ্ধির মধ্যেও একটা আটকাপড়া ভাব, কখনো জোয়ার কখনো ভাটা, বরাবর বজায় থেকেছে।

ইংরেজরা না চাইলেও এ শতাব্দীর গোড়া থেকেই আর্থিক এই পরিস্থিতির মধ্যে বদল ঘটতে শুরু করে। নানা দুর্যোগ সইতে হলেও ধীরে ধীরে আধুনিক জাতীয় শিল্পের একটা ক্ষীণ ধারা জন্মলাভ করে বাড়তে থাকে। ইংরেজ নিজের প্রয়োজনেও কিছুকিছু শিল্প প্রবর্তন না করে পারে না। প্রথম মহাযুদ্ধের পর থেকেই বিশেষ করে এই আর্থিক ও সামাজিক আলোড়ন স্পষ্ট করে দেখা দেয়। খুবই আশ্চর্যের বিষয় যে প্রথম মহাযুদ্ধের পর থেকেই লোকবৃদ্ধির ধারাতেও একটা নতুন গতি স্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠতে শুরু করেছে।

যাই হোক, জন-সংখ্যার এই আধুনিক ইতিহাস বিচার করলে, লোকবৃদ্ধির কয়েকটা বিশেষ বিশেষ ভাগ চোখে পড়বে। প্রথম ভাগটা হল ছিয়াত্তরের মন্বন্তর থেকে ১৮৭০ সাল পর্যন্ত। এরও আবার দুটি পর্ব। ১২৫/৩০ সাল পর্যন্ত প্রথম পর্বে ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের ক্ষতি তখনো কাটে নি। দ্বিতীয় পর্বে ক্ষতি কাটিয়ে ওঠার যুগ। মোট লোকবৃদ্ধি হলেও এখনো মধ্যে মধ্যে লোকক্ষয় হচ্ছে, বৃদ্ধি বিশেষ উল্লেখযোগ্য নয়।

দ্বিতীয় ভাগটা হল ১৮৭০ থেকে ১৯১৪ সাল পর্যন্ত। এইটের লক্ষণ লোকবৃদ্ধির শুরু। শিল্পের পত্তন হয়েছে, কৃষিতে লোকের চাপ বৃদ্ধি হয়েছে। লোকে কৃষি ছাড়া অন্য জীবিকার সন্ধান করছে। তৃতীয় ভাগটা হল ১৯২১ কিংবা ১৯১৪ সাল থেকে ১৯৪৬ সাল পর্যন্ত। এর প্রধানতম লক্ষণ হল জনবৃদ্ধি। মধ্যে অবশ্য ইনফ্লুয়েঞ্জা

প্রভৃতি মহামারীতে লোকক্ষয় ঘটেছে। কিন্তু সমগ্রভাবে ধরলে এটা হল বিশেষ করে লোকবৃদ্ধির যুগ। শেষ ভাগ বলা যায় স্বাধীনতার পর থেকে আজ পর্যন্ত। এই ভাগটায় যেমন বাড়ছে লোক, তেমনি বাড়ছে অর্থনৈতিক ক্ষয়িষ্ণুতা, কৃষির উপর চাপ এবং বেকারি—তুই-ই এক চূড়ান্ত পরিস্থিতির দিকে এগিয়ে এসেছে।

ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশসহ পশ্চিম বাঙলার সাম্প্রতিক (১৯৫১ সালের গণনা) লোকসংখ্যা ও ঘনতার একটা তুলনামূলক ছবি পরিশিষ্টে দেওয়া হল—

'ক' শ্রেণীর রাজ্যের মধ্যে পশ্চিম বাঙলায় ঘনতা সবচেয়ে বেশী, আসামে সবচেয়ে কম। সব রকমের রাজ্য ধরলে ত্রিবাঙ্কুর-কোচিন রাজ্যের ঘনতা অবশ্য আরো বেশী। পশ্চিম বাঙলা দ্বিতীয়। 'ক' শ্রেণীর রাজ্যের মধ্যে পশ্চিম বাঙলা আবার আয়তনে ক্ষুদ্রতম। মধ্যপ্রদেশ বৃহত্তম। মোট লোকসংখ্যায় উত্তর প্রদেশ প্রথম, পশ্চিম বাঙলা পঞ্চম।

● বসতির ঘনতা

পশ্চিম বাঙলায় এই লোকসমষ্টি কি ভাবে কোথায় ছড়িয়ে আছে তা জানা দরকার। দেড়শ বছর আগে পশ্চিম বাঙলার যে সমস্ত খবর পাওয়া যায় তাতে মনে হয় তখন মোটামুটি সমান ভাবেই সারা দেশময় লোক ছড়িয়ে ছিল। কিন্তু এখনকার চেহারা দেখলে লোকবিন্যাসের মধ্যে ভয়ানক বৈষম্য চোখে পড়বে। কোনো এলাকায় গিজগিজ করছে লোক, কোথাও বিস্তীর্ণ এলাকায় লোক আছে কি নেই, বোঝা দায়। কোথাও বসতির ঘনতা অতিশয় উঁচু

কোথাও নীচের দিকে। পশ্চিম বাঙলার বিভিন্ন জেলা অনুসারে এই ঘন বসতির একটা তালিকা পরিশিষ্টে তুলে দেওয়া হল—

পশ্চিম বাঙলার সমস্ত জেলা জুড়ে লোক-বিন্যাসের এই চিত্র থেকে কয়েকটা দরকারী কথা বেরিয়ে আসে। যেমন প্রথমেই দেখা যাচ্ছে, লোক-বিন্যাসের দিক থেকে দুটি ভাগ আলাদা হয়ে আসছে। একটি শহর অঞ্চল, আর একটি গ্রামাঞ্চল। শহরে লোকের ভিড়, গ্রামাঞ্চলে লোকের স্বল্পতা। পশ্চিম বাঙলায় জন-সংখ্যা যে বেড়ে চলেছে তা আগেই বলা হয়েছে। কিন্তু এই বৃদ্ধির একটা ধরন আছে। সব জায়গায় সমানভাবে তা বাড়ছে না। শহরে যে হারে বাড়ছে, গ্রামে তত নয়। ১৮৭২ থেকে ১৯৫১ এই প্রায় ৮০ বছরে গ্রামাঞ্চলের গড় ঘনতা বেড়েছে ৩৯৫ থেকে ৬১০— অর্থাৎ মাত্র দেড় গুণের কিছু বেশী। কিন্তু এই সময়েই শহর এলাকায় ঘনতা বেড়েছে ৩,৪১১ থেকে ১৩,৬৩২, প্রায় চার গুণ!

শহর-গ্রামের এই তফাত ছাড়াও আরো একটি তফাত করা সম্ভব—বর্ধমান বিভাগের সঙ্গে প্রেসিডেন্সি বিভাগের। ১৮৭২ সালে বর্ধমান বিভাগের মোট ঘনতা ছিল প্রতি বর্গমাইলে ৫৩৯। এর মধ্যে গ্রামাঞ্চলে ৫১৩, শহরাঞ্চলে ২,৫৪৮। তুলনায় প্রেসিডেন্সি বিভাগের মোট ঘনতা তখনমাত্র ৩৫৫এর মতো, গ্রামাঞ্চলের ঘনতা আবার মাত্র ২৯৫—বর্ধমান বিভাগের তুলনায় প্রায় অর্ধেক। এ থেকে প্রমাণ হচ্ছে, পশ্চিম বাঙলায় বর্ধমান বিভাগটাই আগে সমৃদ্ধ হয়ে উঠেছিল। লোকের টান ছিল এই দিকটাতেই। তারপর ৮০ বছর ধরে লোক যখন বাড়তে শুরু করেছে, তখন বর্ধমান বিভাগটার চেয়ে বেশী বেড়েছে প্রেসিডেন্সি বিভাগে। ১৮৭২ থেকে ১৯৫১ সাল—এই সময়টায় বর্ধমান বিভাগের ঘনতা বেড়েছে

৫৩৯ থেকে ৭৮৬—প্রায় দেড়গুণ। অথচ প্রেসিডেন্সি বিভাগে বেড়েছে ৩৫৫ থেকে ৮১০—দু-গুণেরও বেশী। গ্রামের কথা ধরলে এই বৃদ্ধি আরো লক্ষ্য করার মতো। ঐ ৮০ বছরে বর্ধমান বিভাগের গ্রামাঞ্চলের ঘনতা বেড়েছে ৫১৩ থেকে ৬৮১ অর্থাৎ প্রায় ১¼ গুণ। সে তুলনায় প্রেসিডেন্সি বিভাগের ঘনতা বেড়েছে ২৯৫ থেকে ৫৫০, প্রায় দু-গুণ। এর একটা কারণও অনুমান করা যেতে পারে। বর্ধমান বিভাগটা আগেই বেশ সমৃদ্ধ ছিল। তাই তার পক্ষে আরো বেশী ঘনতা খুব সম্ভব নয়। বিশেষ করে গ্রামাঞ্চলে লোক ধারণের ক্ষমতার একটা সীমা আছে। বর্ধমান বিভাগ আগে থেকেই সেই সীমার কাছাকাছি গিয়ে পোঁছেছিল।

কিন্তু উত্তরবঙ্গসমেত এখানকার প্রেসিডেন্সি বিভাগের ক্ষেত্রে অবস্থা সে রকম হয় নি। সমৃদ্ধির দিক থেকে এই জায়গাটা পেছিয়ে ছিল বলে তার লোকধারণের ক্ষমতার সীমার কাছাকাছি সে তখনো আসতে পারে নি। ৮০ বছরে তাই এই এলাকার ঘনতাবৃদ্ধির হার বেশ দ্রুতই বাড়তে পেয়েছে। তাছাড়া, একই জমিতে ধান, পাট, তামাক প্রভৃতি শস্য উৎপাদনের সুযোগ থাকায় অল্প জমিতে বেশী লোক খেয়ে টিকে থাকতে পারার সম্ভাবনাও এখানে বেশী।

জেলার হিসেব নিলেও সেই কথা। ধরা যাক, বর্ধমান বিভাগের হুগলী জেলা। ৮০ বছরে এখানকার গ্রামাঞ্চলের ঘনতা বেড়েছে ৮৯০ থেকে ১,০৩০, প্রায় নামমাত্র বৃদ্ধি। তুলনায় শহরে বেড়েছে ৩,২৯৭ থেকে ১০,১১৫, অর্থাৎ তিন গুণেরও বেশী। বর্ধমান বীরভূম প্রভৃতি জেলার ঘনতা বৃদ্ধির প্রকৃতিটাও এই রকমেরই। কিন্তু প্রেসিডেন্সি বিভাগের ধরা যাক জলপাইগুড়ি জেলা। সেখানে গ্রমাঞ্চলের ঘনতা বেড়েছে ৮২ থেকে ৩৬৯, চতুর্গুণেরও বেশী।

কিংবা মালদহ, ৩১১ থেকে ৬৫০ অর্থাৎ দ্বিগুণেরও বেশী। এমনকি ২৪ পরগনা জেলা। শিল্পের দিক থেকে এ জেলাটি আগে থেকেই যথেষ্ট সমৃদ্ধ ছিল। শহরাঞ্চলের ঘনতা তাই এখানে যথেষ্ট বেড়েছে, কিন্তু গ্রামাঞ্চলের ঘনতাও বেড়েছে ২৭২ থেকে ৫৯১, প্রায় আড়াই গুণ! বীরভূম বা বর্ধমানের পক্ষে যা কল্পনার অতীত।

এইবার একটু অন্যদিক থেকে বিচার করা যাক। মোট জনসংখ্যার কত অংশ এবং মোট এলাকার কতটা ভাগ এক-একটা জেলায় পড়েছে তার একটি হিসাবের তালিকা পরিশিষ্টে দেওয়া হল।

তালিকা থেকে দেখা যাবে বর্ধমান পশ্চিম বাঙলার মোট এলাকার ৮.৮২%, বর্ধমানের লোকসংখ্যাও পশ্চিম বাঙলার মোট লোক সংখ্যার ৮.৮৩% ভাগ। অর্থাৎ মোট পশ্চিমবঙ্গের তুলনায় বর্ধমানের এলাকা আর জনসংখ্যার মধ্যে একটা সাম্য আছে। কিন্তু ধরা যাক জলপাইগুড়ি। এ জেলার এলাকা পশ্চিম বাঙলার মোট এলাকার ৭.৭৩% ভাগ। কিন্তু লোকসংখ্যা পশ্চিম বাঙলার মোট জনসংখ্যার মাত্র ৩.৬৯%। অর্থাৎ লোকের চাপ এ জেলায় এখনো বেশ কম। আবার ধরা যাক হাওড়া। আয়তনে জেলাটি পশ্চিম বাঙলার মাত্র ১.৮৫%, অথচ লোকসংখ্যায় ৬.৫০% ভাগ। প্রায় চারগুণ। কলকাতার তো কথাই নেই। তাই শহর গ্রাম, এবং বর্ধমান প্রেসিডেন্সি বিভাগ ছাড়াও আর একটি ভাগ করা সম্ভব—জনসংখ্যার চাপ অনুসারে। (১) যে সব জেলায় জনসংখ্যার চাপ কম—যেমন, বীরভূম, বাঁকুড়া, মেদিনীপুর, কোচবিহার, দার্জিলিঙ, জলপাইগুড়ি, পশ্চিম দিনাজপুর—অর্থাৎ একেবারে পশ্চিমের এবং একেবারে উত্তরের জেলা। (২) যে সব জেলায় জনসংখ্যা এবং এলাকার একটা ভারসাম্য আছে—যেমন, বর্ধমান, নদীয়া,

মুর্শিদাবাদ—অর্থাৎ পশ্চিম বাঙলার প্রায় মধ্য অঞ্চলটুকু ; (৩) যে সব জেলায় জনসংখ্যার চাপ অত্যধিক বেশী—কলকাতা, হুগলী, হাওড়া, ২৪ পরগনা,—ভাগীরথীর দক্ষিণ ভাগের উভয়তীরবর্তী অঞ্চল।

থানা হিসেবে হিসেব করলেও পশ্চিমবঙ্গে জনবসতির অ-সমানতা আরো ফুটে উঠবে। বর্গমাইলে ৭৫০ বা তদূর্ধ্বে লোক বাস করে এমন থানা মুর্শিদাবাদে নেই, অথচ বর্ধমানে আছে শুধু নয়, তাদের মোট লোকসংখ্যার হিসেবটা বেশ ভারী। সেন্সাস রিপোর্ট মন্তব্য করেছেন, পশ্চিম বাঙলার মোট ৩০,৭৭৫ বর্গমাইল এলাকার মধ্যে ৪,১২৬ বর্গমাইল অর্থাৎ ১৩·৪% ভাগ এলাকায় (১০৪টি থানা) জনসংখ্যার চাপ প্রতি বর্গমাইলে ১,০৫০এর চেয়ে বেশী এবং তাতে লোক থাকে মোট জনসংখ্যার ৪২·৭% ভাগ। অন্যদিকে বাকি ৮৬·৬% ভাগ এলাকাতে থাকে মোট জনসংখ্যার মাত্র ৫৭·৩% লোক। অর্থাৎ মাত্র দু-আনা রকম জায়গায় থাকে প্রায় সাত আনা রকম লোক আর বাকি চোদ্দ আনা রকম জায়গায় থাকে মাত্র নয় আনা রকম লোক।

● থানার ঘনতা—গ্রামাঞ্চল

থানা-ওয়াড়ী ঘনতার চাপটা আর একটু খুঁটিয়ে দেখা যাক। পশ্চিম বাঙলায় মোট ২৮০টি থানা আছে। তার মধ্যে ২৮টি থানা কলকাতায়। কলকাতারই লাগোয়া আর ৫টি থানা হাওড়ায়। বাকি ২৪৭টি থানার মধ্যে কিছু থানাকে মফস্বল শহর বলে অভিহিত করা যায়। বাকি থানাগুলি শহর নয়—এদের বলা যাক সম্পূর্ণ গ্রাম্য থানা। সম্পূর্ণ গ্রাম্য এই ধরনের থানার মধ্যে ২৬টি

থানা হল সবচেয়ে জনবহুল—তাদের লোকসংখ্যা প্রতি বর্গমাইলে ১০৫০এর বেশী। ৪৩টি থানার ঘনতাও উঁচুর দিকে—৬১০ থেকে ১,০৫০। বাকি ১০৮টি থানার ঘনতা ৬১০এর দিকে। শহর-থানা অথচ কলকারখানা নেই—এমন ১৭টি থানা আছে যাদের লোক-সংখ্যা ১,০৫০এর বেশী। ২৬টি জনবহুল গ্রাম্য থানার মোট আয়তন এ রাজ্যের ৬.৯% ভাগ, অথচ জনসংখ্যার ১২'২ ভাগই এখানে। এই জনবহুল অঞ্চলটির গড় ঘনতা ১,৪৯৯। এর মধ্যে আবার এমন থানাও আছে যাদের ঘনতা ভয়ানক বেশী। যেমন হাওড়া জেলার সাঁকরাইল, জগাছা। এদের ঘনতা যথাক্রমে ৪,০০৭ এবং ৪,৯০৪। গ্রাম্য থানা—কলকারখানা না থাকলেও এত বেশী লোকের কারণ এই যে এই দুই থানার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলটা হল শিল্পাঞ্চল। এই সব শিল্পাঞ্চলে কাজ করেন এমন বহু মজুর এই দুই থানায় বসবাস করে থাকেন।

যাই হোক, ২৬টি গ্রাম্য থানায় কেমন করে এত লোক ধরতে পারছে তার খোঁজ করা দরকার। গ্রাম্য থানা বলতে বুঝি এমন এলাকা যেখানে জীবিকার প্রধান উপায় কলকারখানা নয়, জমি এবং কৃষি। ২৬টি থানায় যদি আশী বছর ধরে ক্রমাগত এই পরিমাণ চাপ বেড়ে থাকে, তবে ধরতে হবে এই সব এলাকায় কৃষি সম্পদে নিশ্চয়ই তা সইবার মতো বৈশিষ্ট্য আছে।

প্রকৃত ঘটনাও অবশ্য তাই। জনবহুল ২৬টি থানার ৪টি মেদিনীপুরে, ৭টি হুগলীতে, ৮টি হাওড়ায়, ৫টি ২৪ পরগনায় এবং ১টি মালদহে, ১টি মুর্শিদাবাদে। মেদিনীপুর-হুগলী-হাওড়ায় ১৯টি থানাও আবার আসলে একটি ভূখণ্ডেরই পরস্পর-সংলগ্ন অংশ। এক-লাগোয়া এই জমিটাই হল দামোদর, রূপনারায়ণ আর হুগলী

নদীর দাক্ষিণ্যে গড়ে ওঠা। প্রায় এই এলাকার সঙ্গেই লাগোয়া হুগলী নদীর অপর তীরে হল দ্বিতীয় জনবহুল অঞ্চল—২৪ পরগনার ৫টি থানা। বাকি দুটি থানা হল মুর্শিদাবাদ-মালদহে, মহানন্দা-গঙ্গার দুটি পলি-অঞ্চল।

রূপনারায়ণ-হুগলী অববাহিকা অঞ্চল থেকে শুরু করা যাক। জনবহুল ২৬টি থানার ৪টি মেদিনীপুরে—পাঁশকুড়া, মহিষাদল, ময়না, দাশপুর। এই থানাগুলির দিকে চাইলে দেখা যাবে, শিলাই, কাঁসাই, হলদি, রূপনারায়ণ প্রভৃতি নদীনালা এই থানাগুলোর মধ্য দিয়ে বয়ে গেছে। তাতে জলসেচ আর জলনিকাশ দুইয়েরই সুন্দর সুযোগ ঘটেছে। জমিও খুব সরেস, পলিমাটির তৈরী। তাতে একাধিক ফসল ফলে। এর সঙ্গে মিলেছে নদীপথে গ্রাম্য বাণিজ্যের সুবিধা। পাটিমাদুর, তাঁতের কাজ প্রভৃতি কুটির-শিল্পও কৃষির সঙ্গে জড়িয়ে উন্নতি করতে পেরেছে। এই একই অঞ্চল দাশপুর ছাড়িয়ে প্রসারিত হয়ে গেছে হুগলী জেলায়। এখানকার খানাকুল থানা তো রূপনারায়ণের পারেই, পুরশুরা দামোদরের পারে। ১৮৮১ সালে ইডেন খাল এবং পরে রেল-লাইনের সুবিধা হওয়ায় সিঙুর-তারকেশ্বর-হরিপাল থানার কৃষিব্যবস্থার মধ্যেও উন্নতি হতে শুরু করে এবং ঘনতা বৃদ্ধি পায়। হুগলীর এই মধ্য অঞ্চলের দক্ষিণ দিকেই হল হাওড়ার ডানকুনি, রাজপুর, চণ্ডিতলা প্রভৃতি থানা। ইডেন খাল আর কৌসিকি পুনর্খননের ফলে এই অঞ্চলটাও সমৃদ্ধ হতে পেরেছে। মেদিনীপুরের মহিষাদল আর হাওড়ার শ্যামপুর থানার উলটো দিকে, হুগলী নদীর পূর্বপারে ২৪ পরগনার বিষ্ণুপুর, মগরাহাট, ফলতা, কুলপী, এদের অবস্থাও হাওড়া অঞ্চলের মতোই। স্বাভাবিক উর্বরতার সঙ্গে মগরাহাট

জলনিকাশের ব্যবস্থা এবং ডায়মণ্ডহারবারের খালে লক্‌গেট্ বসানোর পর থেকে চাষবাসের প্রভূত উন্নতি দেখা গেছে। সঙ্গে সঙ্গে অন্য উপজীবিকারও সুবিধা পাওয়া গেছে—যেমন মাছধরা, খালপথে বাণিজ্য। রেলপথের সুবিধা থাকায়, কলকাতায় কাজকর্ম করেন এমন অনেক লোকই এসব অঞ্চলে বসবাস করতে পারেন। হুগলীর দুই তীরে ২৩টি সম্পূর্ণ গ্রাম্য এবং ৩টি শিল্পবিহীন থানায় লোক বাস করেন ৩০,৩০,৩২২ জন।

মুর্শিদাবাদ জেলার বেলডাঙা হল আর-একটি জনবহুল থানা। এখানকার মাটি জেলার মধ্যে সবচেয়ে সরেস। চাষ ছাড়াও বড় বড় ফলের বাগান, শব্জীবাগান প্রভৃতি আছে। মালদহের জনবহুল থানা হল কালিয়াচক। প্রতি বছর এখানে এক পর্দা করে পলি পড়ে। কৃষির সঙ্গে আছে রেশম তৈরি রেশম বোনার কুটির-শিল্প।

২৬টি জনবহুল থানার অবস্থা বিচার করলে বেশ বোঝা যায়, এদের প্রত্যেকটিতে জমি অতি উর্বর; জলসেচ ও জলনিকাশের স্বাভাবিক অথবা কৃত্রিম ব্যবস্থা আছে কিংবা হয়েছে; জল ও স্থল পথের যোগাযোগ বেশ ভালো; কৃষি ছাড়াও কুটির-শিল্প এবং অন্যান্য গৌণ উপজীবিকার সুবিধা আছে।

কিন্তু জনবহুল থানা মানেই যে তার জনবহুলতা সীমাহীনভাবে বাড়তে পারে, তা নয়। মেদিনীপুর, হুগলী, হাওড়ার জনবহুল এই থানাগুলির অবস্থা ভালো করে লক্ষ্য করলে দেখা যাবে তাদের ঘনতা প্রথম দিকে বাড়তে শুরু করলেও এখন প্রায় একই জায়গায় স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। তাতে বোঝা যায়, সেচ, কৃষি ও শিল্পের বর্তমান অবস্থা বজায় থাকলে এই সব এলাকায় লোক আর বেশী বাড়বে না। এদের লোকধারণের ক্ষমতা প্রায় সীমায় এসে ঠেকেছে।

● গ্রামাঞ্চলে লোকধারণের সীমা

নানা প্রাকৃতিক ও অন্যান্য সুবিধার ফলে এই ২৬টি জনবহুল থানায় লোকধারণের ক্ষমতা অবশ্যই বেশ উঁচু। যেখানে এই সব সুবিধা তেমন নেই, সেখানে স্বভাবতই লোকধারণের ক্ষমতা খুব কম। এদিক দিয়ে পশ্চিম বাঙলার পশ্চিম সীমানা অঞ্চলটুকুই শুধু হতভাগ্য। এখানকার মাটি জংলা, পাথুরে এবং অনুর্বর। কিন্তু এইটুকু বাদ দিলে বাঙলার অন্যান্য জায়গায় উর্বরতা প্রায় একই রকম। তাই এদের লোকধারণের একটা গড় সীমা-ও বার করা সম্ভব। নানা দিক বিচার করে এই সীমাটাকে ৫০০ বলে ধরা যেতে পারে। সেদিক দিয়ে পূর্ববঙ্গ অনেক ভাগ্যবান। সেখানে কোনো কোনো গ্রামাঞ্চলে ১,০০০এর বেশী ঘনতা হলেও ঘনতা থমকে যাবার কোনো লক্ষণ দেখায় না। কিন্তু এখানের গ্রামাঞ্চলে ৫০০-র বেশী ঘনতা দেখা দিলেই তা প্রায় স্থির হয়ে থাকার, এমনকি নীচুর দিকে নামার লক্ষণ দেখায়।

পশ্চিম বাঙলার বিভিন্ন থানার ঘনতার তুলনা-মূলক তালিকা বাহুল্যের ভয়ে এখানে উদ্‌ধৃত করা হল না। কিন্তু এ তালিকা খুঁটিয়ে দেখলে দেখা যাবে বর্ধমান জেলার যে সব কৃষিপ্রধান অঞ্চলে থানার ঘনতা ৫০০-র উপরে উঠেছিল, তাদের ঘনতা ক্রমাগত বেড়ে গেছে এমন হয় নি। ৫০০ এই সীমায় পৌঁছবার পর তা দশকে দশকে একবার একটু উঠেছে আবার নেমে গেছে। বীরভূম-বাঁকুড়ার থানাগুলি সম্পর্কেও এই ব্যাপারটা লক্ষ্য করা যাবে। মেদিনীপুরের পলি এলাকায় ঘনতা অবশ্য বেশী, ৮০০ ছাড়িয়ে গেছে। কিন্তু পলি ছাড়িয়ে পাথুরে ল্যাটেরাইট মাটিতে

পৌঁছনো মাত্র ঘনতা পাঁচশর কোঠায় এসে নেমেছে। মুর্শিদাবাদের পলি অঞ্চলের ঘনতা ক্রমাগত বৃদ্ধি পেয়ে যেতে থাকলেও অন্যান্য থানায় লোকসংখ্যা দশকে দশকে একবার বেড়েছে, একবার নেমেছে। মালদহের পলি অঞ্চলে ঘনতা বেশী। কিন্তু মহানন্দার পূর্ব ও উত্তরে ঘনতা কোথাও ৫০০ ছাড়ায় নি। পশ্চিম দিনাজপুরে বহু উদ্‌বাস্তুর আগমন হয়েছে। তবু সেখানকার গড় ঘনতা মাত্র ৪৯২। জলপাইগুড়ি, দার্জিলিঙের ঘনতা ৫০০-র অনেক নীচে। কোচবিহারে গড় ঘনতা ৪৭১ হলেও ইতিমধ্যেই এর ওঠাপড়া শুরু হয়ে গেছে। তাতে মনে হয় এইটেই বোধ হয় এর ঘনতার সীমারেখা।

যাইহোক, মোটের উপর ৫০০ই যে আমাদের গ্রামাঞ্চলে লোক-ধারণের সীমা, তাতে সন্দেহ নাই। ৫০০র পরে যদি কোথাও লোক বাড়ে, তা বাড়বে অতি ধীরে ধীরে, যেন অনিচ্ছার সঙ্গে। একবার বাড়লেও আবার তা কমতে চাইবে। বাস্তব ক্ষেত্রে, এই অতিরিক্ত জনসংখ্যা হয় জীবিকার সন্ধানে অন্য কোথাও চলে যান, নয় রোগমহামারীতে ধ্বংস হয়ে যান।

আগে বলেছি, গ্রামাঞ্চল বলতে প্রধানত কৃষির কথাই আসে। গ্রামাঞ্চলের বৈশিষ্ট্য প্রধানত কৃষি-জনিত বৈশিষ্ট্য। গ্রামাঞ্চলের লোক-ধারণের ক্ষমতা প্রধানত কৃষিতে লোকধারণের ক্ষমতার ওপর নির্ভর করে। সেদিক থেকে বিচার করলেও ঘনতাটা ওই ৫০০-র কাছাকাছি দাঁড়ায়। পরিশিষ্টে কৃষি-নির্ভরতার একটা কৌতূহলোদ্দীপক হিসেব সেন্‌সাস্ রিপোর্ট থেকে তুলে দেওয়া হল।—এতে বিভিন্ন জেলার ঘনতার সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে জনসংখ্যার কত অংশ কৃষির ওপর নির্ভর করছেন।

এ হিসেব থেকে দেখা যাবে এক-একটা জেলায় প্রথমদিকে ঘনতা যেমন বাড়ছে, কৃষির-উপর-ভরসা-করা লোকের অনুপাতও তেমন বাড়ছে। যেমন বর্ধমান জেলায়—১৯০১ থেকে ১৯২১ সাল পর্যন্ত এর ঘনতা বেড়েছে, কৃষির ওপর নির্ভরতা-ও বেড়েছে। তা থেকে বোঝা যায় ততদিন পর্যন্ত লোকসংখ্যা যা বাড়ছে তা কৃষিতেই আশ্রয় খুঁজে পাচ্ছে। ১৯২১-এর পরেও বর্ধমানে ঘনতা বাড়ছে কিন্তু কৃষিনির্ভরতা আর বাড়ছে না। ৬৮০ থেকে কমে তা ১৯৫১ সালে দাঁড়িয়েছে ৬২৬। তেমনি মেদিনীপুরে। কৃষি-নির্ভরতার অনুপাত ক্রমাগত বাড়তে বাড়তে ১৯২১ সালে হয়েছে ৮৪০। তার পরেই কমতে শুরু করে ১৯১৫ সালে হয়েছে ৮১৮। নদীয়া, মুর্শিদাবাদ, জলপাইগুড়ি প্রভৃতি জেলাতেও তাই। কয়েকটি জেলায় এ অনুপাত কমতে শুরু করেছে ১৯১১ সাল থেকেই। যেমন হুগলী, হাওড়া, ২৪পরগনা। সে হিসেবে বর্ধমানকেও এই পর্যায়ে ফেলা যায়, কেননা ১৯১১ আর ১৯১২ এর মধ্যে তফাত খুব সামান্য।

এ থেকে দুটি তথ্য বেরিয়ে আসে।

এক, বাঙলাদেশের কৃষিতে মোটের ওপর ১৯১১ সাল থেকে একটা কঠিন সংকট দেখা দিয়েছে। শুধু মাত্র কৃষি অবলম্বন করে আর লোকবৃদ্ধি সম্ভব নয়। কৃষিতে লোক পোষণ করা যাচ্ছে না।

দুই, জলপাইগুড়ি, দার্জিলিঙ প্রভৃতি কয়েকটি জেলা বাদে কৃষিতে লোকধারণের সর্বোচ্চ অনুপাতের সঙ্গে সঙ্গে গ্রামাঞ্চলে যে ঘনতাটাও আমরা পাচ্ছি সেটাও প্রায় ঐ ৫০০র কোঠায়। এদিক থেকেও আমাদের আগের ধারণাটা সমর্থিত হচ্ছে। কৃষি-অঞ্চলের থানায় বর্গমাইলে ৫০০র বেশী লোক বাঁচতে পারে না।

অকৃষি উপজীবিকার পরিমাণ যদি গ্রামাঞ্চলেও বৃদ্ধি পায় তবেই এ সীমা ছাড়ানো সম্ভব।

কিন্তু কৃষি ও গ্রামের বর্তমান অর্থনৈতিক অবস্থায় গ্রামাঞ্চলে যে বাড়তি লোক আর কিছুতেই সেখানে টিকতে পারছে না তাঁরা স্বভাবতই অন্য জীবিকার দিকে যেতে চাইবেন। স্বাভাবিক অবস্থায় এই যাত্রা হয় প্রধানত শিল্পাঞ্চলের দিকে, কেননা কৃষির বিকাশে ধীরগতি অবশ্যম্ভাবী হলেও শিল্পের বিকাশে কোন সীমা পরিসীমা থাকা উচিত নয়। আগে আমরা অন্যপ্রদেশ থেকে আগত লোকদের কথা বলেছি। এখন আভ্যন্তরিক গমনাগমনের একটা হিসাব তুলে দেওয়া গেল। এ হিসেব শুধু তাঁদেরই যাঁরা এই প্রদেশেরই বাসিন্দা, বাইরে থেকে আসেন নি।

লোকে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় যায় নানা কারণে। কেউ হয়তো যান বেড়াতে, কেউ আত্মীয়ের বাড়ি গিয়ে রইলেন সাময়িক ভাবে, কেউ গেলেন জীবিকার সন্ধানে। দীর্ঘদিন ধরে লোক-চলাচলের হিসেব নিলে কিন্তু এই সাময়িক কারণগুলো ছাড়াও একটা মূল ধারা এবং একটা মূল কারণ চোখে পড়বে। সেই কারণটি আগে বলেছি—কৃষিতে সংস্থান না হওয়ায় জীবিকার সন্ধানে প্রধানত শিল্পাঞ্চলের দিকে যাত্রা। ১৮৭২ সালে হাণ্টারের রিপোর্টে দেখা যায় তখনই বাঁকুড়া থেকে লোক জীবিকার সন্ধানে আসাম যেতে শুরু করেছিল। এখনকার হিসেব নিলে মনে হয়, লোক-চলাচল আগের তুলনায় কমেছে। এমনকি ১৯২১-এর তুলনাতেও যে তা ভীষণ কমেছে তা ওপরের তালিকা থেকেই বোঝা যাবে।

কৃষিতে চাপ এবং কৃষিতে সংকট আগের তুলনায় অনেক বাড়া সত্ত্বেও লোক-চলাচল যদি তুলনায় কমে থাকে, তবে তার অর্থ

শিল্পাঞ্চলে গিয়েও তেমন কাজের সুবিধা মিলছে না। সংকট দুদিক থেকেই এ রাজ্যের মানুষকে আড়ষ্ট করে ফেলছে।

দ্বিতীয়ত যেটুকু লোক-চলাচল আছে তার গতি প্রধানত কলিকাতা হাওড়া হুগলী বর্ধমানের দিকে। এই জেলাগুলিতেই লোক চলে যাওয়ার চেয়ে আসার পরিমাণ বেশী। সকলেই জানেন এই জেলাগুলিই হল পশ্চিম বাঙলার বিখ্যাত কয়েকটি

কৃষি থেকে লোক গমন

শিল্পাঞ্চলের আশ্রয়। জলপাইগুড়িতেও আসার পরিমাণ বেশী—তার কারণ চা-বাগান।

গঙ্গার দক্ষিণ এবং হুগলী নদীর পূর্বে অবস্থিত এলাকাটাই হল আভ্যন্তরিক যাওয়া-আসার চক্রনাভি। গঙ্গার দক্ষিণ থেকে গঙ্গার উত্তরে লোক প্রায় যায়ই না।

বর্ধমান বিভাগের লোকেরা অর্থোপার্জনের জন্য অন্যত্র গেলেও নিজ নিজ জেলার সঙ্গে সম্পর্ক বজায় রেখে চলে। যাতায়াতের

সুবিধার জন্য তা করা সম্ভবও হয়েছে। হুগলীর তীরবর্তী শিল্পাঞ্চলে সবচেয়ে বেশী লোক আসে মেদিনীপুর থেকে। মেদিনীপুর থেকে ২৪ পরগনার দক্ষিণে সুন্দরবন অঞ্চলেও লোক গিয়ে থাকে চাষ-আবাদের জন্যে। কলকাতা হাওড়া ২৪ পরগনা থেকে লোক যায় বর্ধমানের শিল্পাঞ্চলে।

শিল্পাঞ্চল ছাড়া কৃষির জন্য লোক যায় মাত্র কয়েকটি জায়গায়—যেমন সুন্দরবন, মালদহের দিয়াড়া অঞ্চল এবং বারিন্দ এলাকা।

শিল্পাঞ্চলের মধ্যেও দেখা যাচ্ছে, হুগলি-হাওড়াতে লোক-আগমনের পরিমাণ আগের চেয়ে ভয়ানক কমেছে। তা থেকে বোঝা যায় এইখানকার শিল্পাঞ্চলেও লোকপোষণের ক্ষমতা ফুরিয়ে আসছে।

লোক-চলাচলের এই প্রকৃতি থেকে পশ্চিম বাঙলার আসল ছবিটার সন্ধান করা যেতে পারে। কলকারখানা এবং শহর এখানে যা আছে তা অন্য প্রদেশের তুলনায় বেশী হলেও তার উন্নতি দিয়ে এখানকার আসল উন্নতি বোঝা যাবে না। তার অনেকখানিই বরং বিদেশীদের এবং বহিরাগতদের উন্নতির পরিচায়ক। এখনকার আসল মানুষদের অবস্থা বুঝতে হলে যেতে হবে বাঙলার মফস্বল থানায় যেখানে ভেঙেপড়া কৃষির উপর নির্ভর করেই এক অতিজনতার বোঝা চেপে আছে, শিল্পাঞ্চল থেকেও জীবিকার ভরসা কমে আসছে বলে যেখানে মানুষেরা উদ্যমহীন আড়ষ্ট জীবনযাত্রায় প্রায় পঙ্গু হয়ে আছে। সেন্‌সাস্‌ রিপোর্টে এ বিষয়ে একটি সুন্দর মন্তব্য করা হয়েছে: These police stations of low density and residential towns are a true index of the fortunes of the peoples of West Bengal.—অর্থাৎ অল্পঘনতার এই সব

থানা এলাকায় এবং আবাসিক শহরগুলিতে পশ্চিম বাঙলার জনগণের সম্পদের সত্যিকার পরিচয় পাওয়া যাবে। সে পরিচয় নৈরাশ্যের।

● জীবিকার খতিয়ান

জীবনযাত্রার এ পরিচয় সম্পূর্ণ করতে গেলে পশ্চিম বাঙলার মানুষের জীবিকার পরিচয়টা আরো একটু খুঁটিয়ে দেখতে হবে। শিল্পপ্রসারের পরিমাণ কত এ দিয়ে একটা দেশের অগ্রগতি কিংবা পশ্চাৎপদতার পরিমাণ করা হয়ে থাকে। ভারতবর্ষের অন্যান্ম প্রদেশের তুলনায় পশ্চিম বাঙলা সেদিক থেকে ভাগ্যবান বটে। এখানে জনসংখ্যার শতকরা ৫৮ জন মাত্র কৃষির ওপর নির্ভর করেন, বাকি ৪২ জন নির্ভর করেন শিল্পাদি অকৃষি জীবিকার ওপর। তার মধ্যে শিল্পের ওপর নির্ভর করেন শতকরা ১৫·৩৬ জন। পরিশিষ্টে পশ্চিম বাঙলা এবং অন্যান্য প্রদেশের জীবিকার ছকের একটা তুলনা দেওয়া হল।

ভারতের অন্যান্য রাজ্যের তুলনায় পশ্চিমবঙ্গে কৃষিজীবিকার অনুপাত কম এবং অকৃষি জীবিকা ও শিল্পজীবিকার অনুপাত বেশী। তালিকায় শিল্প বলতে অবশ্য শুধু কলকারখানা ধরা হয় নি। শব্জি-বাগান, চা-বাগান প্রভৃতি অনেক কিছুই শিল্পের মধ্যে ধরা হয়েছে।

কিন্তু এতে যথেষ্ট খুশি হবার কারণ নেই। কেননা প্রথমত, শিল্পের এ হার পৃথিবীর অন্যান্য অগ্রবর্তী দেশের তুলনায় একেবারেই নগণ্য। দ্বিতীয়ত, আগেই দেখা গেছে, শিল্পসমৃদ্ধির একটা মস্ত ভাগ পশ্চিম বাঙলার আসল অধিবাসীদের করায়ত্ত নয়, তা বিদেশী ও বহিরাগতদেরই সমৃদ্ধ করছে।

কৃষির ক্ষেত্রেও একটু খুঁটিয়ে দেখলে অন্য কথাই মনে হবে। এ প্রদেশে কৃষির ওপর নির্ভরশীলের সংখ্যা অন্যান্য প্রদেশের চেয়ে কম, ১, ৪১, ৯৫, ৬১ জন বা ৫৭'২%। কিন্তু নিজের জমি নিজে চাষ করেন, বা নিজের তত্ত্বাবধানে চাষ করেন এমন লোকের সংখ্যাও এই রাজ্যে সবচেয়ে কম—শতকরা মাত্র ৩২'৩৪। অর্থাৎ জমির ওপর যাঁরা নির্ভর করেন তাঁদের বেশীর ভাগ লোকেরই সে নির্ভরতার কোনো স্থায়ী ভিত্তি নেই। নিজের একখানা জমি নেই, অথচ কৃষিকাজ ছাড়া গত্যন্তর নেই—এই হচ্ছে এখানকার কৃষিজীবীদের প্রধান বৈশিষ্ট্য। তুলনায়, নিজের জমি আছে এমন লোকের অনুপাত বিহারে অনেক বেশী—৫৫'২৯; বিন্ধ্যপ্রদেশে ৬২'৬১, উত্তর প্রদেশে ৬২'২৭, অর্থাৎ প্রায় দ্বিগুণ, আসামে ৫৭'৮৯। এই সব প্রদেশের চাইতেও যে বাঙলায় কৃষি সংকট প্রবলতর, কৃষি একেবারে ভেঙে পড়ার মুখে, এটা তারই একটা লক্ষণ। এরই উলটো পিঠে দেখা যাবে জমিহারা ভাগচাষী ধরনের কৃষকের অনুপাতও এখানেই সবচেয়ে বেশী। মহীশূর ও মধ্যপ্রদেশের তুলনায় এ হার তিনগুণ, উড়িষ্যা ও উত্তর প্রদেশের আড়াই গুণ, বিন্ধ্য প্রদেশের দ্বিগুণ, বিহারের দেড়গুণ, বোম্বাই-মাদ্রাজের সওয়া গুণ। ক্ষেত মজুরদের হারও তুলনায় একই রকম বেশী।

আবার, অকৃষিজীবীদের হার মোটমাট কম হলেও, পশ্চিম বাঙলার কয়েকটি জেলা কিন্তু একেবারেই কৃষিনির্ভর। বীরভূম, বাঁকুড়া, মেদিনীপুর, পঃ দিনাজপুর, কোচবিহারে জনসংখ্যার শতকরা ৮০ জনই কৃষির ওপর নির্ভরশীল। মুর্শিদাবাদে ৬৩, মালদহে ৭৯। কেবল চারটি জেলাতে অকৃষিজীবীদের হার বেশী, তাও ফলের

বাগান, পানের বরজ, চা-আবাদ—এসব ধরে। সে-চারটি জেলা হল হাওড়া, কলকাতা, জলপাইগুড়ি, দার্জিলিঙ।

● কৃষিবর্গের অবস্থা

এই প্রদেশে কৃষি উপজীবিকার অনুপাত অন্য প্রদেশের চেয়ে একটু কম কিন্তু সেটা যে উন্নতির লক্ষণ নয়, বরং কৃষি সংকটের পরিচায়ক, সেকথা আগে বলেছি। এবার কৃষিকাজে যে জনসংখ্যা ছড়িয়ে আছেন অর্থনৈতিক শ্রেণী হিসেবে তাঁদের অবস্থা আর একটু খুঁটিয়ে দেখা যাক। ১৯৫১ সালের জনগণনায় কৃষি উপজীবিকাকে একটা-একটা শ্রেণী বা বর্গ হিসেবে ভাগ করে দেখানো হয়েছে। কৃষিক্ষেত্রে এই যে বিভিন্ন রকমের শ্রেণীর অবস্থান, তার অর্থ কৃষিকাজ থেকে যা পাওয়া যায় তা সমানভাবে কৃষিকর্মীদের সকলের কাছে পৌঁছচ্ছে না, কেউ কিছু না করে পাচ্ছে অনেক, কেউ সারা বছর খেটেও উপোস দিতে বাধ্য হচ্ছে। এর মূল কারণটা রয়েছে আমাদের জমির মালিকানা ব্যবস্থার মধ্যে। এতে একদল আছেন, ইংরেজ আমলের চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে যাঁরা জমির উপস্বত্বভোগী, অথচ জমির জন্যে তাঁরা একটুও খাটেন না, একটুও খরচ করেন না। ঠিক তার উলটো দিকে আছেন অসংখ্য চাষী, যাঁরা খাটেন, যাঁদের জন্যেই জমিতে ফসল হয়। কিন্তু জমির মালিক না হওয়ায় তাঁরা অতি অল্প পেয়ে ভাগচাষী বা দিনমজুর ক্ষেতমজুর হয়ে দিন কাটান। এর মধ্যে ভাগচাষীরা জমির সঙ্গে প্রায় আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধা—চাষ ছাড়া আর কোনো বাঁচার উপায় তাঁদের নেই। ক্ষেতমজুর দিনমজুররা তাঁদের চেয়েও নিঃস্ব, তবু পুঁজিবাদী

অর্থে একটু স্বাধীন—অর্থাৎ একই মালিকের বদলে একাধিক মালিকের কাছে তাঁরা তাঁদের মেহনতশক্তি বিক্রি করতে পারেন।

সংখ্যায় শতকরা ০·৬০ জন যেখানে খাজনাভোগী সেখানে শতকরা ২৪·২৭ হলেন ভাগচাষী আর ক্ষেতমজুর। এটা হল মোট জনসংখ্যার হিসেব। শুধুমাত্র কৃষিজীবীদের ধরলে, এ অনুপাত আরো বাড়বে। তাতে ভাগচাষী ক্ষেতমজুরের সংখ্যা হবে প্রায় শতকরা ৪২ জন এবং খাজনাভোগীরা হবেন মাত্র শতকরা দেড়জন। নিজের জমি নিজে অথবা নিজের তত্ত্বাবধানে চাষ করেন এমন লোকের ওপরেই কৃষির সচ্ছলতা নির্ভর করে। কৃষির উন্নতি আমাদের দেশে আপাতত একমাত্র এই পথেই হওয়া সম্ভব। কেননা যে জমি নিজের নয় তাতে চাষ করতে চাষী উৎসাহ পায় না। দ্বিতীয়ত তাতে চাষ করলেও, খাজনাভোগীরা তার ফসলের এতখানি আত্মসাৎ করেন যে অবশিষ্ট উৎপন্নটুকু দিয়ে চাষের উন্নতি হবার কোনো সুযোগই থাকে না, পেটে খেতেই ফুরিয়ে যায়। জনগণনায় এই মালিক-চাষীদের অনুপাত হচ্ছে মোট জনসংখ্যার শতকরা ৩২·৩৪ জন। শুধু কৃষিজীবীদের ধরলে এ অনুপাত অবশ্য বেড়ে হবে শতকরা প্রায় ৫৭ জন। কিন্তু খুবই সম্ভব যে এর আসল অনুপাত আরো কম হবে। যাঁরা মূলত খাজনাভোগী, এমন অনেক লোক জমিদারী প্রথা উচ্ছেদের ভয়ে নিজেদের খাজনাভোগী পরিচয় গোপন করার জন্যে এই বর্গে নাম দিয়েছেন বলে সন্দেহ করার কারণ আছে। যাই হোক, সম্পূর্ণ স্বাভাবিক কৃষি অর্থনীতি হলে এই অনুপাত হওয়া উচিত ছিল প্রায় শতকরা ১০০ ভাগ। সেক্ষেত্রে নিজের জমি আছে এমন চাষী এখানে বড় জোর তার

অর্ধেক। কৃষি যদি এই অবস্থায় থাকে তবে নিজে থেকে তার তো উন্নতি হবেই না, দারিদ্র্যের সৃষ্টি করে কৃষি শিল্পের বাজারকেও সংকুচিত করে ফেলবে—এই হল অর্থনীতিক পণ্ডিতদের মত।

অঙ্কের হিসেবে সারা বাঙলার যে ছবিটা এখানে ফুটে উঠেছে, সরাসরি একটা তুটো নমুনা এলাকার ছবির সঙ্গে মেলালে তা আরো জীবন্ত হয়ে উঠবে। এদিক থেকে বীরভূম জেলার কথা ধরা যাক। ১৯৩৭ সালে এখানে কয়েকটি গ্রামে প্রত্যেক পরিবারের আয়ব্যয়ের হিসাব নেওয়া হয়েছিল। দেখা গেল মোট ৬৮০টি পরিবারের মধ্যে নিজে চাষ করেন না অথচ জমির মালিক এমন পরিবার ১৪০টি, নিজের জমি নিজে চাষ করেন এমন পরিবার মাত্র ৯০টি। ভাগচাষী পরিবার ১৪৬টি; কৃষান অর্থাৎ নিজের জমিও নেই হালবলদও নেই, মনিবের জমি ও হালবলদে চাষ করেন এমন পরিবার ৭৫টি; কৃষিমজুর ১৩৮টি। অর্থাৎ একদিকে ১৪৩টি উপস্বত্বভোগী পরিবার, অন্যদিকে ৩৫৯টি পরিবার হল ভূমিহীন মেহনতকারীর দল। ২০ বছর আগেই এই অবস্থা। এখন যে তা আরো কত ভয়াবহ হয়ে উঠতে পারে তা সহজেই অনুমেয়।

এবার মালিকদের দিকে তাকানো যাক। ১৯৩২ সালে বীরভূম জেলার শিউড়ি, খয়রাসোল, আর তুবরাজপুর থানার জনসংখ্যার ৬.৪৮% ছিলেন ব্রাহ্মণ, কিন্তু তাঁদের দখলে ছিল ৭৫.৭৭% ভাগ জমি। ব্রাহ্মণ মানে তাঁরা অবশ্যই কেউ নিজে চাষ করতেন না। মধ্যস্বত্ব ভোগ করতেন এমন লোকের সংখ্যা ছিল ৬৫.০%, রায়তী স্বত্ব ৭.৫%।

উপরের আলোচনা থেকে বাঙলায় বিভিন্ন জেলার কৃষি সংকটেরও একটা তুলনামূলক ছবি পাওয়া যাবে। দেখা গেছে, ভাগচাষীদের অনুপাত সবচেয়ে বেশী জলপাইগুড়িতে—প্রতি দশ হাজার কৃষিজীবীর মধ্যে প্রায় সাড়ে পাঁচ হাজার লোকই হলেন ভাগচাষী। আর খুব অল্প জোতদার এখানে হাজার হাজার বিঘা জমির মালিক। পশ্চিম দিনাজপুর, কোচবিহার, দার্জিলিঙ, মালদহ, হুগলী, মেদিনীপুর, বর্ধমান প্রভৃতি জেলাতেও ভাগচাষীর সংখ্যা বেশ উঁচু। অন্যদিকে একেবারেই জমি-জিরেত হাল-বলদ নেই এমন সব ভূমিহীন মজুরের সংখ্যা সবচেয়ে বেশী হল হাওড়া আর বীরভূমে। বর্ধমান, বাঁকুড়া, হুগলী, নদীয়া, মুর্শিদাবাদেও তা বেশ উঁচু। ভূমিহীনতার ও নিঃস্বতার এ হল দুটি পর্যায় মাত্র।

মালিক চাষী, অর্থাৎ যাঁদের নিজের জমি আছে এবং নিজেই কিংবা নিজের তত্ত্বাবধানে তা চাষ করেন, তাঁদের সংখ্যা মোট কৃষিজীবী সংখ্যায় কম-বেশী অর্ধেকের মত। কিন্তু তার মানে এঁদের অবস্থা যে খুব ভালো তা নয়। কারণ নামে মালিক হলেও এঁদের অধিকাংশই হলেন অতি অল্প এক-এক টুকরো জমির মালিক মাত্র। আসলে, জমি খণ্ড বিখণ্ড হয়ে ক্ষুদে ক্ষুদে এমন এক-একটা জোতে পরিণত হয়েছে, যে তা থেকে একটা পরিবারের ভালোরকম ভরণপোষণই সম্ভব নয়।

পশ্চিম বাঙলার পক্ষে সবচেয়ে বেশী পরিমাণ জোতের আকার মাত্র ১·০১ থেকে ২ একর। এক হাজারে এই রকম জোত হল ১৭৮টি। ০ থেকে ৪ একর অর্থাৎ ১২ বিঘা পর্যন্ত জমি—এমনি জোত হাজারে মোট ৬২১টি। অর্থাৎ মালিক চাষী বলতে যে সংখ্যাটা পেয়েছি তাদের অর্ধেকেও বেশী এমন জোতের মালিক যাকে

অর্থনৈতিক জোত বলা যায় না। ১৫ বিঘার বেশী জমি আছে এমন জোত পশ্চিম বাঙলায় হাজারকরা মাত্র ২৯২টি অর্থাৎ পাঁচ আনা রকমও নয়।

দেখা যাবে, ১৯২১ সাল থেকে মাথাপিছু জমির পরিমাণ কী ভয়ানক কমে আসছে। ১৯৫১ সালে একটু বৃদ্ধি দেখা গেছে বটে, কিন্তু তার মস্ত একটা কারণ হিসেবের সংশোধন। আগে হিসেবের তেমন বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি ছিল না। ১৯৪৩-৪৪ সালে নানারকম নমুনা তদন্তের পর নতুন করে যে হিসেব নেওয়া হয় সেইটে ১৯৫১ সালে দেওয়া হয়েছে। তাতে একটু বৃদ্ধি হলেও ১৯২১ সালে যেখানে মাথাপিছু জমির পরিমাণ ৫১·৪ সেণ্ট সেখানে ১৯৫১ সালে তা কমে হয়েছে ৪৫·২ সেণ্ট।

জমির এই অসম বণ্টনের প্রকৃতিটা অর্থনৈতিক। তার সঙ্গে আরো একটি অসাম্য আমাদের এখানে জড়িয়ে আছে।—সেটি হল জাতিভেদপ্রথার নাগপাশ। পূর্বে কথিত বীরভূমের গ্রাম-গুলির তদন্ত থেকে দেখা গেছে, নীচু জাতের লোকদের ভাগে জনপ্রতি যে পরিমাণ জমি পড়ে একজন ব্রাহ্মণের ভাগে পড়ে তার চেয়ে অনেক বেশী পরিমাণ জমি। কায়স্থদের বেলাতেও তাই। অন্যদিকে জাতচাষী বাউড়ীরা জনসংখ্যায় ১৩·৪২ হলেও মোট জমির মাত্র ০·১১% ভাগ তাঁদের বরাতে পড়েছে। যাঁরা চায করেন না তাঁরাই জমির মালিক। যাঁরা জাতচাষী তাঁদের ভাগে নামমাত্র জমি।

সারা পশ্চিমবঙ্গে কৃষিজীবীদের মধ্যে ৩২,৬৪,৯০০ জন অর্থাৎ শতকরা ২৩ জন তফশীলী হিন্দু, ৯,২১,২০০ অর্থাৎ শতকরা ৬·৫ জন খণ্ডজাতীয়। ৪৭ লক্ষ তফশীলীদের মধ্যে ৩৩ লক্ষ এবং পৌনে

বারো লক্ষ খণ্ডজাতীয়ের মধ্যে সোয়া নয় লক্ষের উপজীবিকা কৃষি। ভাগচাষীদের মধ্যে ৪০·৮% এবং ভূমিহীন ক্ষেত-মজুরদের মধ্যে ৪৫·৮% তফশীলী হিন্দু ও খণ্ডজাতীয়। অর্থাৎ জাতিভেদের কোঠায় যাঁদের অবস্থান যত নীচে, ভূমিস্বত্বের কোঠাতে তাঁদের অবস্থা তত নিঃস্ব।

পরিশিষ্টে জাতিভেদ হিসেবে কৃষিবর্গের কোন কোঠায় কত জন তার একটা তালিকা দেওয়া হল।

● অকৃষি উপজীবিকা : হ্রাসবৃদ্ধি

কৃষি ছেড়ে এবার অকৃষি উপজীবিকার দিকে নজর দেওয়া যাক। আগে যে হিসাব দেওয়া হয়েছে তা থেকে দেখা যাবে অকৃষি উপজীবিকার হার পশ্চিমবঙ্গে অন্যান্য প্রদেশের তুলনায় বেশী —শতকরা ৪২·৭৯। বাইরে থেকে দেখলে মনে হবে, তাহলে এখানে কলকারখানা তো নেহাত সামান্য নয়। ইংরেজ আমলে এতদিন এই রকম বাইরে-থেকে-দেখা কতকগুলো ঘটনার ওপর জোর দিয়ে ইংরেজ প্রচারকরা বলে বেড়াতেন, ইংরেজ শাসনে এদেশের উন্নতি হচ্ছে, শিল্প-বিস্তার হচ্ছে। অবশ্য সন্দেহ নেই শিল্প-বিস্তার খানিকটা হয়েছে, কিন্তু তার জন্য ইংরেজ শাসন সাহায্য করেছে না বাধা দিয়েছে সেটাই প্রশ্ন। তা ছাড়া শুধু যেখানটায় বৃদ্ধি হয়েছে সেইটা দেখলাম, যেখানে ধ্বংস হয়েছে সেটা দেখলাম না—তাতে পুরো ছবিটা পাওয়া যায় না। তাই ইংরেজ আমলে কি পরিমাণ শিল্প ধ্বংস হয়েছে, তার হিসাবটা আগে নিয়ে দেখি। অতীতে আমাদের দেশে বড়ো বড়ো কলকারখানা ছিল না। কিন্তু লোকসংখ্যার বিপুল একটা অংশ ছোটো ছোটো নানারকম

কুটীর শিল্পে নিযুক্ত থাকতেন। মোট জনসংখ্যার কর্মসংস্থানের মধ্যে এইভাবে একটা ভারসাম্য ছিল। কিভাবে ইংরেজ শাসনের শুরুতেই বাঙলার তাঁতশিল্প, মসলিন শিল্প প্রভৃতি ধ্বংস হল, সে কথা অনেকেরই জানা। কিন্তু তার পরেও যে ক্রমাগত শিল্প সংকুচিত হয়ে এসেছে, বিশেষ করে শিল্প-উপজীবিকার নানা ক্ষেত্র থেকে লোকসংখ্যা হ্রাস পেয়ে আসছে, তা অনেকের জানা নেই। ইংরেজ আমলের প্রথম দিককার সমূহ ধ্বংসের কোনো বৈজ্ঞানিক হিসেব কেউ রেখে যায় নি। কিন্তু জনগণনার ফলে এই শতকের মোটামুটি নির্ভরযোগ্য একটা হিসাব আমরা পেতে পারি। ১৯৫১ সালের পরিসংখ্যানের বিবরণী থেকে গত পঞ্চাশ বছরে বিভিন্ন উপজীবিকায় লোকসংখ্যার হ্রাসবৃদ্ধির হিসেব করা হয়েছে। তা থেকে দেখা যাবে, গুটিকয়েক কলকারখানা ছাড়া এমন অজস্র ক্ষেত্র ছিল যেখানে আমাদের দেশের লোকেরা খেটে খেতেন, কিন্তু সে সব জায়গায় এখন খেটে খাওয়ার উপায় কমে যাচ্ছে। গৃহশিল্প, কুটির শিল্প, বৃহৎ শিল্প—এ সবই হল উৎপাদন শিল্প। বৃহৎ শিল্পে লোকসংখ্যা বাড়লেও সব মিলিয়ে দেখা যায় ১৯১১ সন থেকে এই সবগুলি উৎপাদন-শিল্পে মিলিয়ে ধরলে কর্মীর সংখ্যা কমছে। ১৯১১ সালে অকৃষি উৎপাদনে লোক ছিল প্রতি দশহাজারে ৮০৪ জন। ১৯৫১ সালে তা ৬৭১-এ নেমে এসেছে। ১৯৩১ সাল ছিল পৃথিবী-ময় মন্দার যুগ। স্বভাবতই তখন এ সংখ্যা ছিল আরো কম—দশ হাজারে মাত্র ৫৫১।

বিশেষ বিশেষ কী কী ক্ষেত্রে এই হ্রাস ঘটেছে তা জেনে রাখা ভালো। পশুপালন, কীটপালন, ফুল-ফল-শব্জীর বাগান, বনজ দ্রব্য সংগ্রহ, কাঠ কাটা, বনের পশু ও মাছ মারা—এই সব

কাজে আগে অনেক লোক খাটত। এখন অবস্থা ক্রমেই শোচনীয় হচ্ছে। এই সব বিভাগ থেকে ১৯১১ সালে দশ হাজারে ৩০৪ জনের ভাতকাপড় জুটত। ১৯৫১ সালে সে হার কমে দাঁড়িয়েছে ১৪০। অতীত বাঙলার কথা বলতেই আমাদের মনে ভেসে ওঠে গোলাভরা ধান, গোয়ালভরা গোরু। এখন পশ্চিম বাঙলায় গোচারণভূমি খুঁজে বার করতে হয়। গোরু আনতে হয় সব বাইরে থেকে। বাঁকুড়া বীরভূম মেদিনীপুরে এমন এক-একটা বিস্তীর্ণ অঞ্চল আছে, যেখানে দুধলো গোরু দেখাই যায় না। মৌমাছি, গুটিপোকা, তসর ও লাক্ষার চাষ—এসবই গুটিয়ে যাচ্ছে।

যাঁরা মাছ ধরেন, এমন মৎস্যজীবীর সংখ্যাও ভয়ানক কমেছে। ১৯১১ সালে তাদের সংখ্যা ছিল দশ হাজারে ৬৪ জন, ১৯৫১ সালে সে সংখ্যা কমে দাঁড়িয়েছে দশ হাজারে ১৯।

ছোটখাটো ঘরোয়া শিল্পের কথা ধরা যাক: ঘি, মাখন, মিঠাই, আচার প্রভৃতি তৈরী ; ধান ভানা, মুড়ি ভাজা, চিড়া কোটা, ডাল ভাঙা প্রভৃতি কাজ মেয়েরা করতেন এবং তা থেকে বিপুল একটা সংখ্যার ভরণপোষণ হত। এখন এসব বৃত্তি লুপ্ত হতে চলেছে। ঘানির কাজ এখন কলে চলে। তাঁতে উৎপাদন বাড়লেও কর্মী কমে, ডাল প্রভৃতি কোটা-ভানার কাজে ১৯১১ সালে ছিল ২,০২,৭৮০ জন লোক, ১৯৫১ সালে তা কমে দাঁড়িয়েছে মাত্র ১, ১১, ৪১৩।

সুতাকলের আমদানিতে সুতা-কাটুনি ও তাঁতীর সংখ্যা যা কমেছে সে তো কিংবদন্তী হয়ে আছে। ১৯০১ সালেও কার্পাস শিল্পে নিযুক্ত উপার্জনকারীর সংখ্যা ছিল ৮৮, ৪৮৪ জন, ১৯৫১ সালে তা কমে দাঁড়িয়েছে মাত্র ৭৬, ৬০৫। ইট, টালি, খোলা, মাটির বাসন-কোসন, কাঁচের চুড়ি দানা ইত্যাদি কাজ যাঁরা করতেন, করাতী,

গরাদী, ছুতোর মিস্ত্রি, প্লাইউড-কারক, এবং ঝুড়ি ও চাঙারি তৈরি করে যাঁরা খেতেন তাঁদের সকলের সংখ্যাই কমেছে।

উৎপাদনের কথা ছেড়ে বাণিজ্যের দিকে দেখা যাক। যে দেশটা উন্নতি করেছে, সেখানে পণ্ডিতদের হিসাবমতো, শতকরা ৬ জনের বেশি ব্যবসা-বাণিজ্যে নিযুক্ত থাকার কথা। পশ্চিমবঙ্গে এ হার একেবারে অর্ধেক—শতকরা ৩'১২। আগে এ হার আরো কম ছিল। বিপুলসংখ্যক উদ্বাস্তু ব্যবসায়ীর আগমনে কিছুটা বেড়েছে এই মাত্র।

বাঙালীর পক্ষে উপার্জনের সবচেয়ে বড়ো ক্ষেত্র অবশ্য চাকরি-বাকরি। শুধু ভদ্রলোকের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে না রাখলে দেখা যাবে, এই ক্ষেত্রেও অবস্থা অবনতির দিকে, এমন কি ভদ্রবৃত্তিতে, বেসরকারী চাকরির সংখ্যা কমেছে। আইন-ব্যবসায় প্রভৃতি বৃত্তি এখন অনেক সংকুচিত।

চৌকিদার, দফাদার প্রভৃতি গ্রাম্য কর্মচারীর সংখ্যা কমে গিয়েছে। ঝি-চাকর হয়ে যারা ভাতকাপড়ের যোগাড় করত তাদের সংখ্যাও কম। প্রথমত গৃহভৃত্য রাখার মতো সংস্থান নেই, তা ছাড়া লোকের মর্যাদাজ্ঞানও বৃদ্ধি পেয়েছে।

ধোবা, নাপিত এসব বৃত্তিতেও বিপুল সংখ্যাহ্রাস হয়েছে। অন্য দিকে কর্মবৃদ্ধি হয়েছে নিচের এই সব ক্ষেত্রে :—

কলকারখানা : ধাতু, রাসায়নিক দ্রব্য প্রভৃতির উৎপাদনে বিস্তর কর্মবৃদ্ধি হয়েছে। খুচরো ব্যবসায়ে লিপ্ত লোকের সংখ্যা অনেক বেড়ে গেছে। বিশেষ করে উদ্‌বাস্তু আসার পর থেকে ছোটোখাটো দোকান ও ফিরিওয়ালার খুব চল হয়েছে।

পরিবহণেও লোক বেড়েছে, বিশেষ করে বিমান চলাচলের ক্ষেত্রে। রেলে এবং অন্যান্য নানাবিধ বৃত্তির মধ্যে, বিদ্যুৎ ও গ্যাস

সরবরাহ, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, শাসন বিভাগ হোটেল, রেস্তোরাঁ, সিনেমা—এই সমস্ত ক্ষেত্রেই কর্মসংস্থান প্রসারিত হয়েছে।

হ্রাসবৃদ্ধির এই খতিয়ান দেখে স্বভাবতই মন খারাপ হবার কথা। কেন না সমগ্রভাবে অকৃষি উপার্জনের ক্ষেত্রে লোক-ধারণের ক্ষমতা বাড়ছে না। ছোটো হয়ে আসছে এবং লুপ্ত হয়ে যাচ্ছে বাঙলার ছোটো ছোটো কর্মশালা ও বৃত্তি, যাদের মারফত সারা দেশ জুড়ে বিপুলসংখ্যক লোককে পোষণ করা সম্ভব হত। অন্যদিকে আধুনিক কলকারখানা যা গড়ে উঠছে তাতে ঐ লোকদের সকলের সংস্থান হচ্ছে না। তার ওপর র‍্যাশনালাইজেশন নামে এক নতুন ব্যবস্থা চালু হতে চলেছে। এ হল যন্ত্রশক্তির ব্যবহার বাড়িয়ে অল্পমজুরে বেশি উৎপাদন করার ব্যবস্থা। তাতে স্বভাবতই কল-কারখানার মজুরের সংখ্যা আরো কমবে। পশ্চিম বাঙলার ক্ষেত্রে তাই এ এক ভারি তাজ্জব অবস্থা দাঁড়িয়েছে—যতো কলকারখানা, ততো বেশি করে বেকার, ততো বেশি বেশি দুরবস্থা। তাছাড়া এই সব কলকারখানার মূলধন বহুক্ষেত্রে বিদেশী, কর্মীরা অনেকেই পশ্চিম বাঙলায় স্থায়ী বাসিন্দা নয়। ফলে এই সব কল-কারখানার যেটুকু বা সুবিধা তারও অনেকখানিই পশ্চিম বাঙলার ভোগে লাগে না।

● শিল্পাঞ্চল

তার মানে অবশ্যই এ নয় যে অতীত যুগে ফিরে গেলেই সমস্যার সমাধান হবে। নদীর মতোই সভ্যতা কখনো তার উৎসের দিকে বইতে পারে না, তাকে যেতেই হবে সামনে।

কলকারখানার যে যুগ এসে গেছে তাকে বাদ দিয়ে চলার কোনো উপায় আমাদের নেই। শুধু তাই নয়, আধুনিক যুগে একটা দেশের উন্নতি-অবনতির খতিয়ান করতে গেলে এইটে হল প্রধান বিচার্য বিষয়। একটা দেশের চাষবাস সীমাহীনভাবে বাড়তে পারে না। কারণ চাষবাস নির্ভর করে জমির পরিমাণের ওপর। কিন্তু দেশের জমির পরিমাণ তো আগে থেকেই প্রায় ঠিক হয়ে আছে।

অন্যদিকে সীমাহীনভাবে বাড়তে পারে তার শিল্প। কেননা যতো ছোটো দেশই হোক, সেখানে কয়টার বেশি কারখানা ধরবে না, তার হিসেব এখনো কেউ করতে পারে নি।

এখন যে পরিমাণ কলকারখানা বসবে, সেই পরিমাণেই দরকার হবে মালপত্রকে এক জায়গা থেকে আর-এক জায়গায় নেওয়ার জন্য পরিবহণ ব্যবস্থা—রেল, লরি, জাহাজ। সেই পরিমাণেই এই সব মালপত্র ভিত্তি করে বৃদ্ধি পাবে ব্যবসায়-বাণিজ্য এবং অন্যান্য চাকরি-বাকরি। সেই জন্যে একটা জাতির আর্থিক পরিস্থিতির নিশানা পাওয়া যাবে তার শিল্পগত উৎপাদনের মধ্যে।

পশ্চিম বাঙলার এই শিল্প—এই সব কলকারখানা—বিশেষ বিশেষ কয়েকটি অঞ্চলকে আশ্রয় করে গড়ে উঠেছে। এমনি শিল্পাঞ্চল বলতে মোটমাট আছে তিনটি : হিমালয়ের তরাই অঞ্চলের বিরাট চা-বাগান এলাকা; আসানসোল মহকুমা আশ্রয় করে কয়লা, লোহা এবং অন্যান্য ধাতু নিষ্কাশনের অঞ্চল ; আর হুগলী নদীর দুই তীর জুড়ে বিস্তীর্ণ কারখানা-পট্টী। রেলের বড়ো ওয়ার্কশপ আছে বলে খড়গপুরকেও শিল্পাঞ্চল বলে ধরা যেতে পারে।

দার্জিলিঙ ও জলপাইগুড়ির প্রধান শিল্প চা। বাগানগুলির এক অংশে চায়ের আবাদ, অন্য অংশ থাকে বাড়িঘর তৈরির কাঠ জ্বালানি প্রভৃতির জন্য সংরক্ষিত। বাগানের পুরনো শ্রমিকদের মধ্যে কিছু কিছু ধানের জমিও বিলি করা হয়। এক-একটা আবাদে বাগানের মজুর-কর্মচারী ছাড়া অন্য লোকের বসবাসের বিশেষ সুবিধা নেই। তাই বসতির দিক থেকে এ অঞ্চলটা খুব পাতলা। তা ছাড়া বিরাট এলাকা জুড়ে শুধু বন। জলপাইগুড়ির গ্রামাঞ্চলের ঘনতা ১৯৪১ সালে মাত্র ৩৪৬ ; ১৯৫১ সালে ৩৫৯। দার্জিলিঙে যথাক্রমে ২৬৮ ও ২৯৬ হিসাবে; দার্জিলিঙ ও জলপাইগুড়িকে শিল্পাঞ্চল বলে ধরলেও আসলে এ হল একটা কৃষি-উৎপাদন মাত্র। অল্প বসতির জন্য এদের থানাগুলিও জনবহুল শিল্প-থানার অন্তর্ভুক্ত হতে পারে নি।

দার্জিলিঙ-জলপাইগুড়ি ছাড়া পশ্চিম বাঙলায় শিল্প-থানা আছে ৬০টি। এর মধ্যে শালানপর, কুলটি, হীরাপুর, আসানসোল, বড়বাটী, রানীগঞ্জ, জামুরিয়া, অণ্ডাল—এই আটটি থানার ৩৯৫ বর্গ-মাইল জুড়ে যে এলাকা সেইটে হল রানীগঞ্জ-আসানাসোল শিল্পাঞ্চল। গুরুত্বের দিক থেকে এইটেই হল সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ, কারণ এই-খানেই মূল কয়েকটি শিল্পের আস্তানা। আসলে এটি হল কয়লাখনি

এলাকা। কয়লাকে ভরসা করে গড়ে উঠেছে লোহা ও ইস্পাত তৈরির কারখানা। সেইসঙ্গে যুক্ত হয়েছে বিদ্যুৎ উৎপাদন, রেল
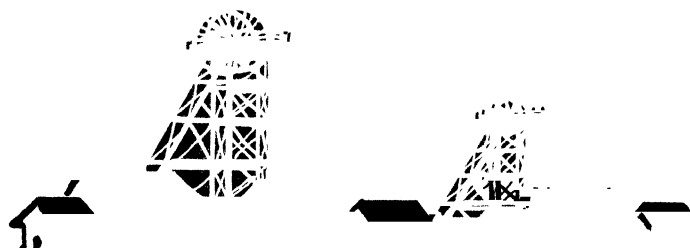
ইঞ্জিন তৈয়ারি, অ্যালুমিনিয়ম প্রভৃতি গুরুত্বপূর্ণ শিল্প। অন্যদিকে গড়ে উঠেছে পাইপ, সাইকেল, কাগজ, তাপসহ ইট, চিনেমাটি প্রভৃতি নানা রকমের কারখানা। কয়লা, বিদ্যুৎ আর লোহা— এই তিনটি মূল বস্তু কাছে থাকায় এ অঞ্চলের শিল্প-সম্ভাবনা অফুরন্ত। তাছাড়া আশেপাশের সিংভূম, মানভূম, বাঁকুড়া, বীরভূম থেকে সস্তায় মজুর এখানে মেলে অনেক। জলবায়ুও অনুকূল। পশ্চিম বাঙলার ভবিষ্যৎ উন্নয়নের জন্য তাই এই এলাকাটিকে যথাসাধ্য বিকশিত করে তোলাই দরকার হবে। কিন্তু ভৌগোলিক কারণে এ অঞ্চলটার পক্ষে পশ্চিম বাঙলার অভ্যন্তরে প্রসারিত হবার চাইতে বিহারের খনি অঞ্চলের দিকে প্রসারিত হওয়াই বেশী সুবিধা। ১৯৩১ সাল পর্যন্ত এই অঞ্চলে লোক তেমন বাড়ে নি। কিন্তু ১৯৩১ সন থেকে লাফিয়ে লাফিয়ে লোক বাড়ছে। এই অঞ্চল সমেত বর্ধমানের লোকবৃদ্ধির হার ছিল ১৯১১-২১ দশকে মাত্র ১'৭। ১৯৩১-৪১ দশকে সেখানে এ হার দাঁড়ায় ৭১'৮ এবং ৪১-৫১ দশকে ৪৫'২। এ হার যে কতো বেশী তা কলকাতার দিকে তাকালে

বোঝা যাবে। ১৯৪১-৫১ দশকে কলকাতাতেও এ হার ২০'৯-এর বেশি ওঠে নি। এ অঞ্চলটা যে ক্রমেই বাড়ছে তার আর-একটা লক্ষণ আভ্যন্তরীণ গমনাগমন। মেদিনীপুর প্রভৃতি জেলা থেকে যতো লোক বাইরে চলে যায় তাদের মূল স্রোতটা আগে ছিল হুগলী-তীরের শিল্পাঞ্চল অভিমুখে। এখন তা কমে গিয়ে রানীগঞ্জ-আসানসোলের দিকে বেড়েছে।

হাওড়া-হুগলী জেলার মধ্যে গঙ্গার তীর ধরে সরু এক ফালি অঞ্চল হল হাওড়া-হুগলী শিল্পাঞ্চল। দৈর্ঘ্যে এটি ৫০ মাইল, প্রস্থে প্রায় ২½ মাইল। এই মোট ১২৬ বর্গমাইলের মধ্যে পড়ে হুগলী জেলার মগরা, চুঁচুড়া, চন্দননগর, ভদ্রেশ্বর, শ্রীরামপুর, উত্তরপাড়া এবং হাওড়া জেলার বালি, হাওড়া, বঁ্যাটরা, গোলাবাড়ি, মালিপাঁচ-ঘরা, শিবপুর আর বাউাড়য়া থানা।

হুগলী নদীর অন্যপারে হল বারাকপুর-কলকাতা-বজবজ শিল্পাঞ্চল। এরও দৈর্ঘ্য মোটামুটি ৫৫ মাইল, প্রস্থ ৫ মাইল। এই ২৭৫ বর্গমাইলের মধ্যে পড়ে কলকাতার ২৮টি থানা এবং টালিগঞ্জ, বরাহনগর, জগদ্দল, বজবজ, মেটেবুরুজ, টিটাগড়।

এই দুটি শিল্পাঞ্চলের প্রধান তাৎপর্য এই যে এরা বন্দরের কাছে। মাল তোলা-নামানো, গুদামজাত করা আর চালান দেওয়ার সুবিধার জন্য অল্প একটু জায়গার মধ্যে এখানেই সবচেয়ে বেশি কলকারখানা ঘেঁসাঘেসি করে গড়ে উঠেছে। অসংখ্য ছোটো-বড়ো এবং নানা জাতের শিল্পের মধ্যে প্রধান শিল্প হল চটকল, তাতে কাজ করেন প্রায় আড়াই লক্ষ মজুর। তাছাড়া আছে নানা ধরনের ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্প—তাতেও সোয়া লক্ষ মজুর আছেন। তাছাড়া সুতাকল, তাতে প্রায় এক লক্ষ শ্রমিক নিযুক্ত। জনবহুলতার দিক থেকে

এই শ্রমিক অঞ্চল দুটি পশ্চিম বাঙলার পক্ষে সর্বাগ্রগণ্য হলেও রানীগঞ্জ-আসানসোলের মতো মূল শিল্প কিছু কিন্তু এখানে নেই। আয়তনে এ অঞ্চল দুটি ভবিষ্যতে প্রসারিত হবে এমন সম্ভাবনাও কম। প্রায় একশ বছর ধরে এই অঞ্চল দুটির সীমা প্রায় একই আছে অথচ ঘনতা এবং কলকারখানার সংখ্যা ক্রমাগত বেড়ে এক অস্বাস্থ্যকর অবস্থার সৃষ্টি করেছে।

১৯৩১ সন পর্যন্ত এই দুই অঞ্চলের ঘনতা বৃদ্ধির হার তত বেশি নয়। চুঁচুড়া, মগরা থানার ঘনতা তো কমেই গিয়েছিল। কিন্তু ৩১ সালের পর থেকে হুগলী জেলার শিল্প-থানাগুলোর ঘনতা লাফিয়ে লাফিয়ে বেড়েছে। যুদ্ধের দরুনই সম্ভবত ৪১ সালের বৃদ্ধি তো একেবারে চমকে দেবার মতো। ১৯৫১ সালের বৃদ্ধি কিন্তু অতো বেশি নয়। তা থেকে মনে হয় ৪১-৫১ সালের শেষ দিক থেকে এ অঞ্চলের কর্মসংস্থান-ক্ষমতা ফুরিয়ে আসছিল। ব্যারাকপুর-বজবজ-কলকাতার জনবৃদ্ধির ধারাও প্রায় একই রকম। এর মধ্যে ১৯৩১ সাল পর্যন্ত ব্যারাকপুর-বজবজ অঞ্চলে ঘনতা বার বার কমেছে। কিন্তু কলকাতার লোকবৃদ্ধিতে কখনো ছেদ পড়ে নি।

১৯৫১ সালের গণনায় পশ্চিম বাঙলার নানা শহরে এবং বিশেষ করে কলকাতা সম্পর্কে নানা তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। দেখা গেছে প্রাচীন শিল্পগুলির ধ্বংসের সঙ্গে সঙ্গে একদা জনবহুল কিছু শহরের লোকসংখ্যারও বেশ অবক্ষয় দেখা দিয়েছিল, যেমন বর্ধমান জেলার দাঁইহাট, কাটোয়া, কালনা ; বীরভূমের শিউড়ী ; বাঁকুড়ার সোনামুখী পাত্রসায়র; মেদিনীপুরের ঘাটাল; হুগলির আরামবাগ; মুর্শিদাবাদের কাসিমবাজার বহরমপুর ; মালদহের ইংরেজবাজার। অন্যদিকে বিশেষ করে বেড়ে উঠেছে কলকাতা। কিন্তু কলকাতা বা অন্যান্য

ফেঁপে-ওঠা শহরের মস্ত দুর্বলতা এই যে তাদের বৃদ্ধি যে পরিমাণ, সে পরিমাণ শিল্পায়ণ কিন্তু তাদের পিছনে নেই। পশ্চিম বাঙলায় ১৯২১ সালে পুরবাসীদের মোট সংখ্যা ছিল শতকরা ১৫ ; ১৯৩১ সালে শতকরা ১৬ ; কিন্তু ১৯৫১ সালে তা বেড়ে গেছে শতকরা ২৫এ। এদের মধ্যে একটা বড়ো অংশই অবশ্য বহিরাগত। তাদের বাদ দিলে পুরবাসীর সংখ্যা দাঁড়ায় শতকরা ২১।

যাই হোক, পশ্চিম বাঙলার শহর বলতে কিন্তু এক কলকাতাই প্রায় সব কিছু অন্ধকার করে নিজে জ্বলছে।

কলকাতা এবং কলকাতার সংলগ্ন বরাহনগর, দমদম, উত্তর-দক্ষিণ দমদম আর বালী এই চারটি নগর মিলে মোট আয়তন মাত্র ৮৫.২ বর্গমাইল। বৃহৎ কলকাতা বা কলকাতা শিল্পাঞ্চলের আয়তন ১৬০ বর্গমাইল এবং তার গড় ঘনতা ২৮, ৬১৩। অন্যদিকে কলকাতা আসানসোল বাদে অন্যান্য শহরাঞ্চলের গড় ঘনতা মাত্র ৫ ,০৭৮।

পর্যাপ্ত শিল্প ছাড়াই এই অস্বাভাবিক স্ফীতির অর্থ দারিদ্র্যেরও বৃদ্ধি। কলকাতা ভারতবর্ষের সবচেয়ে বড়ো শহর, সবচেয়ে কুশ্রী শহর। ইউরোপের আধুনিক শহরগুলোর তুলনায় একে প্রায় বস্তি শহর বললেই চলে। কলকাতার প্রায় সিকিভাগ লোক বস্তিতেই বাস করে। এবং বস্তি বলতে যে কি বস্তু বোঝায় তা ১৯৪৮-৪৯ সনের একটি তদন্ত থেকে বোঝা যাবে। ৩১৭৯টি বস্তির অনুসন্ধান থেকে দেখা গিয়েছিল, এক-একটি ভাড়াটিয়া পরিবারের ভাগ্যে গড়ে ১.১০টি ঘর পড়ে। সে ঘর আসলে এক-একটি খুপরি, অধিকাংশ ঘরের মেঝে স্যাঁতসেঁতে কাঁচা মাটির, বায়ু চলাচলের ব্যবস্থা নেই বললেই হয়। এই রকম এক-একটি ঘরে এক-একটি পরিবার যাদের লোকসংখ্যা গড়ে ৩.৪৮।

অনুসন্ধানে দেখা যায় ৯০% বস্তিঘরে পৃথক রান্নাঘর নেই। মোট ৬১'৭% বস্তিঘরে জলের দারুণ অভাব। যেখানে জল আছে সেখানেও ২৫'৬ জনের জন্য মাত্র একটি কল। গড়ে ২৩ জনের জন্য পায়খানা একটি।

বস্তি বাদে বাকি কলকাতার অবস্থাও তেমন ভালো নয়। ১৯৫১ সালে গণনায় দেখা গেছে প্রতি ঘরে গড়ে ৩'৬ জন লোক বাস করেন।

● শ্রমিক সংবাদ

পশ্চিম বাঙলার শিল্পাঞ্চলের এই বিশদ বিবরণ থেকে মনে হতে পারে কুটির শিল্পের অবনতি হলেও বড়ো বড়ো শিল্প হয়তো এখানে বাড়তির দিকে। কিন্তু কলকারখানার সংখ্যা আর আয়তন ছেড়ে তাতে নিযুক্ত শ্রমিকদের দিকে তাকালে খটকা লাগবে। যেমন প্রথমত শ্রমিকদের সংখ্যা। বড়ো বড়ো কলকারখানা যাই থাক, তাতে শ্রমিকদের সংখ্যা কিন্তু এখনো বাড়ছে না।

বাগিচা-শিল্পে ১৯০১ সালে ছিল ৩ লক্ষ লোক। ১৯৫১ সালে তা কমে হয়েছে ২'৫৬ লক্ষ। পশ্চিম বাঙলার বৃহৎ শিল্পে দৈনিক নিয়োজিত লোক ১৯৩৯ সালে ছিল ৫, ৩২, ৮৩০ ; ১৯৪৫ সালে তা বেড়ে হয় ৭, ০২,৮২১ কিন্তু ১৯৫১ সালে তা আবার কমে দাঁড়িয়েছে ৬, ৪৮, ৩০৩। পৃথিবীর অন্যদেশের কথা ছেড়ে দিচ্ছি, ভারতবর্ষেই অন্যান্য প্রদেশ কিন্তু এদিকে দ্রুত এগিয়ে যাচ্ছে। নিচের তালিকা থেকে বোঝা যাবে, অন্যান্য প্রদেশে শ্রমিক-সংখ্যা বেড়েই যাচ্ছে, আমাদের এখানে তার চিহ্ন নেই—

	১৯৩৯	১৯৪৫	১৯৪৯	১৯৫১
পশ্চিম বাঙলা	৫,৩২,৮৩০	৭,০২,৮২১	৬,৬৫,০০৮	৬,৪২,৩০৩
বোম্বাই	৪,৬৬,০৪০	৭,৩৫,৭৭৪	৭,৮৯,৪৬৩	৮,০৮,০৯৩
বিহার	৯৫,৯৮৮	১,৬৮,৪০৮	১,৫৫,৩৩৪	১,৭৫,৫৫৮
আসাম	৫২,০০৩	৫৮,০৭০	৬১,১৩২	৬৮,৬১৪
মধ্য প্রদেশ	৬৪,৪৯৪	১,১০,২৬৩	৯৬,২৭৩	১,১৫,৯৭৮
মাদ্রাজ	১,৯৭,২৬৬	২,৭৯,১৭৬	৩ ২৩,৯৫০	৪,২২,২৯১
উত্তর প্রদেশ	১,৫৯,৭৩৮	২,৭৬,৪৬৮	২,৩৩,৮৩৭	২,২৪,৫৫১

বৃহৎ শিল্পের শ্রমিকসংখ্যার দিক থেকে ১৯৩৯ সালে বোম্বাই বাঙলার চেয়ে পিছিয়ে ছিল, এখন বাঙলাকে অনেকখানি ছাড়িয়ে গেছে। মাদ্রাজের উন্নতি হয়েছে দ্বিগুণেরও বেশী। বিহার, উত্তর-প্রদেশ দ্রুত অগ্রসর হচ্ছে কিন্তু পশ্চিম বাঙলা কমতে শুরু করেছে।

শুধু তাই নয়, পশ্চিম বাঙলার শ্রমিকদের বেশী অংশ অবাঙালী যাঁরা সাময়িকভাবে এসে আবার চলে যান। তাই বড়ো বড়ো কলকারখানা থেকে আসল বাঙালীর কর্মসংস্থান ভয়াবহ রকমের কম এবং সংকট ভয়াবহ রকমের বেশী।

এই গেল একটা দিক। অন্যদিকে বড়ো বড়ো কলকারখানা মাত্রই হল অসাম্যের কেন্দ্রস্থল। কলকারখানা থেকে যে পরিমাণ মুনাফা উঠছে, তার বেশি অংশ ক্রমেই মুষ্টিমেয় লোকের হাতে গিয়ে জমছে এবং শ্রমিক-কর্মচারীদের ভাগে ক্রমেই অংশ কমে যাচ্ছে। প্রধানত বাঁচার মতো মজুরির অভাবেই কলকারখানাগুলো একটি চিরস্থায়ী সংঘর্ষের ক্ষতস্থল হয়ে থাকছে। সন্তুষ্ট শ্রমিক ছাড়া শিল্পোন্নয়ন বা উৎপাদন অব্যাহত ভাবে চলতে পারে না। ন্যূনতম অধিকার থেকে বঞ্চিত শ্রমিকদের দিয়ে জোর করে খাটিয়ে নেবার

চেষ্টায় শ্রমবিরোধের পরিমাণ কি বিপুল তা নিচের সংখ্যা থেকে বোঝা যাবে ঃ

বছর	সময়	ধর্মঘট বা লক-আউটের ফলে নষ্ট শ্র
১৯৪৭	সেপ্টেম্বর-ডিসেম্বর	৭,৬৩,০৪৯
১৯৪৮	প্রথম কোয়ার্টার	৪,৮২,২৩০
	দ্বিতীয় কোয়ার্টার	৮,৫৩,৯২০
	তৃতীয় কোয়ার্টার	৫,০৮,৭৫৭ (৫)*
	চতুর্থ কোয়ার্টার	৫,০৮,৭০৭ (৩)
		২৩,৬৩,৬১৪ (৮)
১৯৪৯	প্রথম কোয়ার্টার	৬,৩০,৪৪৩ (৮)
	দ্বিতীয় কোয়ার্টার	৮,৯০,১৯৬ (১)
	তৃতীয় কোয়ার্টার	৫,২১,৬৯২ (৭)
	চতুর্থ কোয়ার্টার	৬,৩০,৭৭০ (৫)
		২৬,৭৩,১০১ (২১)
১৯৫০	প্রথম কোয়ার্টার	৪,৫৯,৮০১ (১)
	দ্বিতীয় কোয়ার্টার	৩,৩৩,৯১১ (৬)
	তৃতীয় কোয়ার্টার	৭৫,৩৮৪ (৯)
	চতুর্থ কোয়ার্টার	২,৯১,৬৭৩ (৩)
		১১,৬০,৭৬৯ (১৯)

● সংকটের খতিয়ান

সবচেয়ে বর্ধিষ্ণু ক্ষেত্র শিল্প। সেখানেই এই অবস্থা। সমগ্রভাবে অকৃষি উপজীবিকার ক্ষেত্রে যে তাহলে অবস্থা আরো খারাপ হবে তা বোঝা যায়। তার প্রথম লক্ষণ হল পোষ্যের চাপ। অকৃষি জীবিকা যাদের প্রধান আশ্রয় তাদের মধ্যে উপার্জনকারীর অনুপাত

* বন্ধনীর মধ্যে যে সংখ্যাগুলো দেওয়া হয়েছে সেগুলি হল এমন সব বিরোধের সংখ্যা যার হিসাব পাওয়া যায় নি এবং নষ্টশ্রমদিবসের মধ্যে ধরা হয় নি।

ক্রমেই কমছে। একজন উপার্জনকারীকে আগে যতগুলি পোষ্য পুষতে হত এখন তার চেয়ে বেশী পুষতে হচ্ছে। সেনসাস রিপোর্টে উপার্জনকারীর একটা হিসাব আছে। ১৯০১ সালে প্রতি ১০ হাজার লোকে উপার্জনকারীর সংখ্যা ছিল ৭৭০। ১৯৫১ সালে তা কমে দাঁড়িয়েছে মাত্র ৬৭১; মনে রাখা দরকার অবাঙালী শ্রমিকেরা প্রায়ই তাদের পোষ্য আনে না। সুতরাং বাঙালী অকৃষিজীবীদের ওপর পোষ্যবর্গের চাপ যে কতো বেশী তা আন্দাজ করা যায়।

দ্বিতীয় একটা লক্ষণ হল, বৃত্তির ক্ষেত্রে পিছু হটা। আগে বলেছি কৃষিতে জীবিকানির্বাহ না হলে লোকে শহরের দিকে যায়, অকৃষি উপজীবিকায় কর্মসংস্থানের জন্যে। অন্যান্য অগ্রসর দেশে উন্নতির একটা লক্ষণই হল কৃষিতে লোক কমে শিল্পে লোকসংখ্যা বৃদ্ধি। লোকবিন্যাসের গতিটা কৃষি থেকে ক্রমেই শিল্পের দিকে। কিন্তু এখানে যারা শিল্পে এসেছে তারাও ক্রমেই পিছু হটে আবার কৃষির ওপর নির্ভর করতে বাধ্য হচ্ছে। সেনসাস রিপোর্টে গৌণ উপজীবিকা বলে একটা ভাগ করা হয়েছে। একজন লোক মাত্র একটি বৃত্তি থেকে গ্রাসাচ্ছাদন করতে পারে না বলে প্রায়ই অন্য আর-একটি বৃত্তি গ্রহণ করে থাকে। ইংলণ্ড প্রভৃতি দেশে যে শ্রমিক সে শুধু মাত্র শ্রমিক, সর্বহারা। জমির সঙ্গে তার প্রায়ই কোনো সম্বন্ধ নেই। কিন্তু পশ্চিম বাঙলায় অনেক শ্রমিক কারখানায় কাজ করলেও দেশের জমি একেবারে ছেড়ে আসতে পারে নি। সেখানকার ফসল কিছুটা না পেলে তাদের চলে না। বর্ধমান বিভাগের হিসাবে দেখা যায় অকৃষি উপার্জনকারীদের মধ্যে ১৯২১ সালে হাজারকরা ৬জন এই ভাবে কৃষিকে গৌণ উপজীবিকা হিসাবে গ্রহণ করেছিল। ১৯৫১ সালে তা বেড়ে গিয়ে দাঁড়িয়েছে

হাজারকরা ৮৩ জন, প্রায় ১৪ গুণ বেশী। এর মানে শিল্প আশ্রয় করলেও ক্রমেই বেশি বেশি লোক ঘুরেফিরে সেই কৃষিতেই এসে ভর করছে।

আর সর্বশেষ লক্ষণ হল স্রেফ বেকারি। কৃষিতে সংকট, কৃষিতে লোক আর ধরছে না। তাই লোকে অকৃষি উপজীবিকা—কলকারখানার দিকে আসতে চাইছে, কিন্তু সেখানেও কর্মসংস্থানের সুযোগ বাড়ছে না। ফলে কৃষিতে আরো বেশি করে চাপ পড়ছে। এবং তা সত্ত্বেও বিপুলসংখ্যক এক জনসমষ্টি না-কৃষি না-শিল্প কোথাও সংস্থান না পেয়ে ভয়াবহ বেকার সমস্যার সৃষ্টি করে চলেছে। এখনো পর্যন্ত এই বেকার সমস্যার পুরো চেহারা অনুসন্ধান করে বার করা হয় নি। সঠিক কোনো হিসাবপত্র পর্যন্ত নেই। তাছাড়া বেকার বলতে এতদিন পর্যন্ত শুধু শিক্ষিত ভদ্রলোকদের কথাই আমাদের মনে হত। কিন্তু তাঁরা ছাড়াও শহরাঞ্চলের হাজার হাজার মেহনতী আছেন যাঁরা এখনো পর্যন্ত লক্ষ্যে পড়েন নি, গণনায় আসেন নি। আর আছেন গ্রামাঞ্চলের লক্ষ লক্ষ কৃষিজীবী বেকার এবং আধা বেকার, যাঁদের কোনো খবরই এ পর্যন্ত কোথাও রাখা হয় নি। তাহলেও কিছু কিছু নমুনা তদন্ত থেকে এই সমস্যার একটা আভাস আমরা পেতে পারি।

পশ্চিমবঙ্গের জনসমষ্টির যে মোটামুটি পরিচয় আগে দেওয়া হল তার সঙ্গে উদ্‌বাস্তুর কথাটা যোগ করতে হবে। পশ্চিম বাঙলার পক্ষে এ এক বিশেষ সমস্যা—ভাঙা দেশের সৃষ্টি এক বিশেষ অভিশাপ। গোটা বাঙলা ভেঙে দুখানা দেশ এবং দুটি রাষ্ট্র হবার

পর থেকে পূর্ববঙ্গের লোক দলে দলে এখানে চলে এসেছেন। কিন্তু এখনো পর্যন্ত এখানকার জীবনযাত্রায়, সর্বোপরি এখানকার অর্থনীতির মধ্যে তাঁরা মিলে যেতে পারেন নি। ভারতবর্ষ এবং পশ্চিম বাঙলা তাঁদের এখনো একটা বিচ্ছিন্ন কোঠায় সমস্যা হিসাবে ঝুলিয়ে রেখেছে। এখনো পর্যন্ত খবরের কাগজে তাঁদের হাজার রকমের দুর্দশার কাহিনী নিত্যই প্রকাশ পেয়ে যাচ্ছে।

ভারতবর্ষের প্রত্যেক প্রদেশেই কিছু না কিছু উদ্‌বাস্তু এসে আশ্রয় নিয়েছেন। সবচেয়ে বেশি উদ্‌বাস্তু অবশ্য এসেছেন পাঞ্জাবে। ১৯৫১ সাল পর্যন্ত প্রায় ৩২ লক্ষ। পাঞ্জাবের মোট জনসংখ্যার তুলনায় তাঁরাই হলেন শতকরা ৩৪'৩৫ ভাগ। পশ্চিম বাঙলায় সে তুলনায় কম—উদ্‌বাস্তুরা এখানে ১৯৫১ সালের হিসাবে

মোট জনসংখ্যার শতকরা ৯' ২৪ ভাগ। এর পরে আসাম—শতকরা ৩'১৩ ভাগ। অন্যান্য প্রদেশে নগণ্য, শতকরা ১ ভাগ করেও নয়।

কিন্তু অনুপাতে কম হলেও সংখ্যায় পশ্চিম বাঙলার উদ্‌বাস্তুরা মোটেই নগণ্য নন। ১৯৫১ সালের হিসাবে তাঁরা ছিলেন প্রায় ২১ লক্ষ। তারপর থেকে আরো কয়েক লক্ষ উদ্‌বাস্তু যে যোগ হয়েছেন তাতে কোনো সন্দেহ নেই। এখনো পর্যন্ত শিয়ালদহ স্টেশন বারে বারেই আশ্রয়প্রার্থীর ভিড়ে করুণ হয়ে উঠছে। ১৯৫১ সাল পর্যন্ত পশ্চিম বাঙলায় উদ্‌বাস্তুর আগমন নিম্নরূপ—

	১৯৪৬	১৯৪৭	১৯৪৮	১৯৪৯	১৯৫০
পুরুষ—	২৪,৩২০	২,০৬,৫১৭	২,১৩,৫৯৮	১,৪০,৬৪১	৪,৯২,৭০০
নারী—	২০,৩০৪	১,৭১,৩৮২	১,৯৫,৪২০	১,৩২,৯৫১	৪,৩২,৪৮৫
মোট—	৪৪,৬২৪	৩,৭৭,৮৯৯	৪,১৯,০১৮	২,৭৩,৫৯২	৯,২৫,১৮৫

	১৯৫১
পুরুষ—	১৬,২৩৮
নারী—	১৪,৬৪১
	৩০,৮৭৯

মোট	
	১১,০৪,০১৪
	৯,৬৭,১৮৩
	২০,৭১,১৯৭

এই উদ্‌বাস্তুদের মধ্যে প্রথমদিকে মধ্য শ্রেণীর লোক বেশি এসেছেন। কিন্তু এখন কুটির-শিল্পী কারুজীবী ও কৃষিজীবীরাও দলে দলে আসতে শুরু করেছেন। এতে যে সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে তা পাঞ্জাবের চেয়েও অনেক গুরুতর। পাঞ্জাবের উদ্‌বাস্তুরা নতুন জনসংখ্যা হিসাবে ভারতে এসে যুক্ত হয় নি। সেক্ষেত্রে এক ধরনের লোক বিনিময় হয়ে গিয়েছিল বলে ধরা যায়। পশ্চিম পাঞ্জাবের থেকে যতো লোক এখানে এসেছেন প্রায় ততো লোকই সেখানে গেছেন। বলতে কি, উদ্‌বাস্তু আগমনের পরেও পাঞ্জাবে ১৯৪১ সালের তুলনায় লোকসংখ্যা শতকরা ০'৫ কমেছে। এ থেকে বোঝা যায়, পূর্ব পাঞ্জাবে মুসলমানদের পরিত্যক্ত জমিতে পূর্ব-পাঞ্জাবে আগত উদ্‌বাস্তুদের পুনর্বাসন খুব একটা জটিলতা সৃষ্টি করে নি। কিন্তু বাঙলায় হয়েছে উলটো ব্যাপার। পশ্চিম বাঙলা

থেকে যাঁরা পূর্ব বাঙলায় গেছেন তাদের সংখ্যা খুব কম। অথচ সেখান থেকে এসেছেন যাঁরা তাঁদের সংখ্যা ২১ লক্ষ। স্বাভাবিক হারে লোকবৃদ্ধি হলে পশ্চিম বাঙলায় ৫০ বছরে যে পরিমাণ লোক বাড়ত, উদ্‌বাস্তু আগমনে তা বেড়েছে হঠাৎ ৫ বছরের মধ্যেই। ফলে এখন পশ্চিমবঙ্গে প্রতি ১২ জন লোকের মধ্যে একজন হলেন উদ্‌বাস্তু। নিচে পশ্চিম বাঙলায় বিভিন্ন জেলার উদ্‌বাস্তুর সংখ্যা দেওয়া গেল—

	মোট	পুরুষ	নারী	মোট জনসংখ্যার অনুপাতে উদ্‌বাস্তু শতকরা হার
পশ্চিমবঙ্গ—	২০,৯৯,০৭১	১১,১৮,৪৭৫	৯,৮০,৫৯৬	+৮.৫
বর্ধমান—	৯৬,১০৫	৫১,১৩২	৪৪,৯৭৩	+৪.৪
বীরভূম—	১১,৭৮৩	৬,২০৫	৫,৫৭৮	+১.১
বাঁকুড়া—	৯,২৯৪	৪,৮১৭	৪,৪৭৭	+০.৭
মেদিনীপুর—	৩৩,৫৭৯	১৭,৪৭৭	১৬,১০২	+১.১
হুগলী—	৫১,১৫৩	২৬,৮৪৪	২৪,৩০৯	+৩.৩
হাওড়া—	৬১,০৯৬	৩২,৯৮৪	২৮,১১২	+৩.৮
২৪পরগনা—	৫,২৭,২৬২	২,৮৪,৮৯৭	২,৪২,৩৬৫	+১১.৪
কলকাতা—	৪,৩৩,২২৮	২,৩৪,২৪২	১,৯৮,৯৮৬	+১৭.০
নদিয়া—	৪,২৬,৯০৭	২,১৯,৩৬৩	২,০৭,৫৪৪	+৩৭.৩
মুর্শিদাবাদ—	৫৮,৭২৯	৩১,১৬৮	২৭,৫৬১	+৩.৪
মালদহ—	৬০,১৯৮	৩০,৯১৮	২৯,২৮০	+৬.৪
পশ্চিম দিনাজপুর—	১,১৫,৫১০	৬১,১৯৭	৫৪,৩১৩	+১৬.০
জলপাইগুড়ি—	৯৮,৫৭২	৫৪,১১৯	৪৪,৪৫৩	+১০০৮
দার্জিলিঙ—	১৫,৭৩৮	৮,৯৩১	৬,৮০৭	+৩.৫
কোচবিহার—	৯৯,৯১৭	৫৪,৮১৮	৪৫,১৩৬	+১৪.৯

এ হল ১৯৫১ সালের লোকগণনার হিসাব। সম্প্রতি পশ্চিম বাঙলা সরকারের পরিসংখ্যান দপ্তর থেকে উদ্‌বাস্তুদের সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থার (১৯৫৫ সালের এপ্রিল-মে,

যুগান্তর ৫ই আগস্ট) একটি বিবরণ প্রকাশিত হয়েছে। তাতে দেখা যায় ১৯৫৫ সালে উদ্‌বাস্তুদের সংখ্যা ১৯৫১ সালের ২১ লক্ষ লোক থেকে বেড়ে ২৮ লক্ষ ৯০ হাজার ৪ শতে এসে পৌঁছেছে ; এই প্রায় ২৯ লক্ষ উদ্‌বাস্তুর মধ্যে ২৭ লক্ষ ২৩ হাজার লোক সরকারী শিবিরের বাইরে বাস করেন।

এই উদ্‌বাস্তুদের দুর্দশা সম্পর্কে একটি কথা বললেই যথেষ্ট হবে। ২৯ লক্ষ উদ্‌বাস্তুর মধ্যে আট বছরে মৃত্যু হয়েছে পৌনে দুই লক্ষ লোকের!

এঁদের মধ্যে ৮৫ হাজার উদ্‌বাস্তু সম্পূর্ণ বেকার। প্রায় ৭৯ হাজার উদ্‌বাস্তু সামান্য কিছু রোজগার করলেও তা নিতান্ত সাময়িক এবং নিতান্তই অপর্যাপ্ত ; মোট ১ লক্ষ ৬৩ হাজার ৮ শত উদ্‌বাস্তু কাজের জন্যে ঘুরছেন।

যাঁরা চাষ আবাদে পুনর্বসতির চেষ্টা করছেন, তাঁদের মধ্যে প্রায় ৭৫ হাজার চাষী আত্মনির্ভরশীল হতে পেরেছেন, কিন্তু প্রায় ৭২ হাজার চাষী সাহায্য ভিন্ন সংসার চালাতে পারেন না।

বাসস্থানের অবস্থাও সংকটজনক। উদ্‌বাস্তুদের শতকরা ৪৩ ভাগ হয় ভাড়া করে নয় অন্য কোনো ভাবে মাথা গুঁজে আছেন। এঁদের বাসস্থান দিতে হলেও শহর এবং গ্রামাঞ্চলে মোট অন্তত ২ লক্ষ ১৯ হাজার ৬ শত বাড়ি নির্মাণ করতে হয়।

● পরশুরামের কুঠার

পশ্চিম বাঙলার জনবিন্যাসের মোটামুটি ভাগগুলো আমরা দেখেছি। এ ভাগ হল প্রথমত ভৌগোলিক ভাগ—কোনো কোনো জায়গায় কিরকম লোক ছড়িয়ে আছে ; তার সঙ্গে জড়িত করে

দেখলাম অর্থনৈতিক ভাগ—কি কি রকমের বৃত্তিতে কি পরিমাণ লোক ধরছে। এবার অন্য রকম একটা ভাগে এই জনসংখ্যাকে ভাগ করে দেখা যাক। এটি হল প্রকৃতির আদিম ভাগ—নারী আর পুরুষ। পূর্বেকার ভাগগুলিতে সামঞ্জস্য না থাকলে যেমন একটা দেশের উন্নতি আটকে যেতে পারে এই ভাগটাতেও তেমনি সামঞ্জস্য না থাকলে সেটাকে দুর্লক্ষণ বলেই ধরতে হবে।

প্রথমে সংখ্যার দিক থেকে বলি। পশ্চিম বাঙলায় ছেলে বেশী, মেয়ে কম। এখানকার স্বাভাবিক জনসংখ্যার হিসাব ধরলে অর্থাৎ নানারকমের বহিরাগত ও অস্থায়ী অধিবাসীদের কথা বাদ দিলে প্রতি ১ হাজার পুরুষে ৯২০ জন নারী। কিন্তু সব মিলিয়ে ধরলে এ সংখ্যা আরো কমে যাবে। প্রতি একহাজার পুরুষে মাত্র ৮৫৯ জন নারী, তুলনায় প্রতি এক হাজার পুরুষে উড়িষ্যায় নারীর সংখ্যা ১,০২২; মাদ্রাজে ১,০০৬; ত্রিবাঙ্কুর কোচিনে ১০০৮। অবাক মনে হলেও এই মোট সংখ্যার দিক থেকে ভারতবর্ষে পশ্চিম বাঙলা হচ্ছে সবচেয়ে নারীহীন জায়গা। পুরাণের গল্পে আছে পরশুরাম তাঁর কুঠার দিয়ে মাতৃহত্যা করেছিলেন। মনে হবে বুঝি পরশুরামের সেই কুঠারটা এখনো বাঙলা দেশেই পড়ে আছে। এবং প্রথম থেকেই বেছে বেছে নারীর ওপরেই তার আঘাত এসে পড়ছে বেশি।

বয়সের প্রায় প্রত্যেক গ্রুপে পুরুষের চেয়ে নারী কম। ১৯৫০ সনে ডিসেম্বরে নারীর মাতৃত্ব সম্বন্ধে অনুসন্ধান করা হয়েছিল। তাতে দেখা যায় নবজাত শিশুদের মধ্যে প্রথম বৎসরে ছেলে যতো মরে মেয়ে মরে তার চেয়ে বেশি। প্রসবকালেও বহু প্রসূতির মৃত্যু ঘটে থাকে। একথা ঠিক মেয়েদের জন্মের হার ছেলেদের জন্মের

হারের চেয়ে কম। তবু নারীর হারের ক্রমাবনতির কারণ সম্ভবত এই যে মেয়েরা এখানে অনাদৃতা, তাই তাদের মৃত্যুর হারও বেশি। ইউরোপে ঠিক এর উলটো।

শুধু সংখ্যাল্পতার কথাই নয়। শিক্ষাদীক্ষা, উপার্জন, স্বাবলম্বন সব দিক থেকেই নারীদের অবস্থা কঠিনতর। পশ্চিম বাঙলায় যারা মোটামুটি লিখতে পড়তে পারে এমন সাক্ষরদের একটা হিসাব নিচে দেওয়া হল—

প্রতি দশহাজার লোকের মধ্যে

	১৯৩১	১৯৪১	১৯৫১
মোট	১১৪২	১১৮২	২৪৫৪
পুরুষ	১৮৫৪	২৭৭৭	৩৪৬৮
নারী	৩৪০	৮৩৪	১২৭৩

১৯৫১ সাল পর্যন্ত উচ্চ মধ্য প্রভৃতি সব রকমের শিক্ষা ধরলে তালিকা এইরকম ঃ

	পুরুষ	নারী
স্নাতকোত্তর (পোস্ট গ্রাজুয়েট)	১১,৯৪৪	১,১৫২
স্নাতক (গ্রাজুয়েট)	৫৩,৪৯৪	৫,৮৬৫
মধ্য পরীক্ষায় উত্তীর্ণ (ইণ্টারমিডিয়েট)	৯১,৩৮১	১২,২৬০
আগু পরীক্ষায় উত্তীর্ণ (ম্যাট্রিক, স্কুলফাইনাল)	৩,০৮,৩১৯	৪৩,৯৪৯
মধ্যমান (ক্লাস সিক্স এবং তার উপর)	১০,৫৯,৮১০	১,৮৭,৩০১
সহজ চিঠিপত্র পড়তে পারে	৩০,৩৮,২৪৯	১১,০৫,০১৩
সবরকমের মোট	৪৬,২৮,৫৮১	১৪,৪৯,২১৬
নিরক্ষর	৮৭,১৬,৮৬০	১,০০,০৫,৬৫১
জনসংখ্যা	১,৩৩,৪৫,৪৪১	১,১৪,৬৪,৮৬৭

এ তালিকা থেকে যেমন শিক্ষার অসন্তোষজনক একটা ছবি পাওয়া যাচ্ছে, তেমনি পাওয়া যাচ্ছে এই ক্ষেত্রে নারীদের আরো বেশি পিছিয়ে থাকার খবর। শতকরা ২৪'৫ অর্থাৎ মোট চার আনা রকমের লোক এ প্রদেশে শিক্ষিত। কিন্তু শুধু পুরুষদের কথা ধরলে এই অনুপাত বেড়ে দাঁড়ায় শতকরা ৩৪'৭ অর্থাৎ সাড়ে পাঁচ আনা রকমের। অথচ মেয়েদের বেলায় তা দাঁড়াবে দুই আনাও নয়। শিক্ষার মান ধাপে ধাপে পিরামিডের মতো যে ভাবে উঠে গেছে তাতে প্রত্যেকটি ধাপেই মেয়েদের এই পিছিয়ে থাকাটা চোখে পড়ার মতো।

স্বাবলম্বন ও উপার্জনের কথা ধরলে অবস্থা যে আরো কতো খারাপ তা ফুটে উঠবে পরিশিষ্টে পশ্চিম বাঙলায় স্বাবলম্বী ও পরমুখাপেক্ষীর একটা হিসাব দেওয়া হয়েছে, তা থেকে। মেয়েদের করুণতর অবস্থার কথা বেশ বোঝা যায়। বেশ ফুটে ওঠে যে এ সমাজটা এমনভাবে তৈরি যেন পুরুষের মুখাপেক্ষী হয়ে থাকাটাই মেয়েদের একমাত্র ভাগ্য। মোট স্বাবলম্বীদের মধ্যে এখানে ৬৮ লক্ষই হল পুরুষ। স্বাবলম্বী নারী মাত্র দশ লক্ষের কিছু বেশি। মোট নারীর সংখ্যা মোট পুরুষের চেয়ে অনেক কম হলেও নারী-পরমুখাপেক্ষীর সংখ্যা পুরুষ-পরমুখাপেক্ষীদের চেয়ে দেড় গুণেরও বেশি।

বাইরে থেকে দেখলে মনে হবে পশ্চিম বাঙলায় নারীপ্রগতি বোধহয় যথেষ্ট পরিমাণে হয়েছে। মধ্যবিত্ত ঘরের অনেক মেয়েই আজ জীবিকার সন্ধানে বেরিয়েছেন। পুরুষদের পাশাপাশি মেয়েরাও জীবিকার্জন করছেন। কিন্তু হিসাব করলে মোট সমস্যার তুলনায় এটা যে কতো নগণ্য তা বোঝা যাবে। আগেই

দেখেছি জনসংখ্যার বিরাট অংশই এখানে ছড়িয়ে আছে গ্রামাঞ্চলে, কৃষির ওপর নির্ভর করে। এই কৃষিজীবী নারীদের শতকরা ৯৪ জনই হলেন পরমুখাপেক্ষী। শহরের চাকুরিজীবী মধ্যবিত্ত নারীরা অকৃষিজীবী নারীদের একটা অংশ। এখন সমগ্র অকৃষিজীবী নারীদের মধ্যে পরনির্ভরতা একটু কম হলেও শতকরা ৮৭ জনের কম নয়।

অকৃষিজীবী স্বাবলম্বীদের বর্তমান অবস্থা বোঝাবার জন্যে নিচে একটা ছক দেওয়া হল :—

আসলে অকৃষিজীবীদের মধ্যেও নারী-উপার্জকের সংখ্যা না বেড়ে বরং কমেছে। ১৯৫১ সালের গণনা থেকে দেখা যায় ১৯১১ সালের তুলনায় ১৯৫১ সালের নারী-কর্মীর সংখ্যা কমে প্রতি একশ জনের জায়গায় বর্তমানে আছেন মাত্র ৭১ জন। নারীদের অর্থোপার্জনের ক্ষেত্র ছিল প্রধানত কুটিরশিল্প—ধানভানা, পশুপালন ইত্যাদি। আগেই বলেছি এ সমস্ত বৃত্তি একেবারে সংকুচিত হয়ে এসেছে।

মেছুনী, সুতাকাটুনী প্রভৃতি নানা কাজে মেয়েরা আগে ছিল, এখন তা আর নেই। এমন কি কলকারখানাতেও, যেমন খনি প্রভৃতিতে, নারী-শ্রমিকের সংখ্যা বেশ হ্রাস পেয়েছে। এর সঙ্গে যদি মনে রাখি বাঙলার শিল্পে নারীকর্মীদের অধিকাংশ বহিরাগত, তবে আসল বাঙালী নারীদের অবস্থা যে আরো কতো খারাপ তা আন্দাজ করা যাবে। নারীকর্মীর এই সংখ্যাহ্রাসের দায়িত্ব যে পুরুষদেরই নিতে হবে তাতে কোনো সন্দেহ নেই। সেনসাস-অধিকর্তা অশোক মিত্র-প্রণীত "আমার দেশ"-এ এ বিষয়ে স্পষ্টই মন্তব্য করা হয়েছে: "কর্মসংস্থানক্ষেত্রের তীব্র প্রতিযোগিতায় পুরুষ নারীকে স্থানচ্যুত করিয়াছে, ইহাই নারী কর্মী হ্রাসের প্রধান কারণ।"

● ভাষার বাঁধন

জনতত্ত্বের বহু বিচিত্র বিষয় এই বইয়ের পরিসরে সাঙ্গ হবার নয়। তাই জাতি, ধর্ম, বয়স ইত্যাদি আরো নানা দিক থেকেও পশ্চিম বাঙলার জনসমষ্টি যেভাবে ছড়িয়ে আছে তার পুরো আলোচনায় না গিয়ে আমরা শুধু আর-একটি বিষয়ের উল্লেখ করে শেষ করব: ভাষা। ইতিমধ্যে কৌতূহলীদের জন্য জানিয়ে রাখা যাক যে ধর্মে ধর্মে ভেদ এবং "জাতের নামে বজ্জাতির" শেষ পশ্চিমবঙ্গে এখনো হয় নি। এখানকার জনসংখ্যার ৭৮. ৪৫% হিন্দু, ১৯.৮৫% মুসলমান, ০.৪৪ উপজাতিধর্ম, ০. ১২% শিখ, ০.৩০ বৌদ্ধ, ০·৭০ খ্রীষ্টান; এছাড়া অন্যান্য কিছু ধর্ম আছে। হিন্দুদের মধ্যেও ভাগাভাগির অন্ত নেই—মোট ১ কোটি ৯৪ লক্ষ হিন্দুর মধ্যে তপশীলী জাতই হল ৪৭ লক্ষ। এদের মধ্যে ৯ লক্ষ বাগদী, ৭ লক্ষ

রাজবংশী। তপশীলী উপজাতির সংখ্যা ১১ লক্ষ ৬৫ হাজার। তার মধ্যে সাড়ে আট লক্ষই হল সাঁওতাল। জনবিন্যাসের ভৌগোলিক ছক দেখলে দেখা যাবে এই তপশীলীরা অতীত জাতিনির্যাতনের সাক্ষ্য বহন করে এখনো পর্যন্ত বসবাস করছেন প্রায়ই লোকালয় থেকে দূরে, গাঙ্গেয় উপত্যকার থেকে দূরে, ২৪ পরগনা, মেদিনীপুর, বাঁকুড়া, জলপাইগুড়ি প্রভৃতি জেলায়, সমুদ্র ও অনুর্বর জঙ্গলের পাহাড়ের ধারে ধারে।

যাই হোক, এবার ভাষার কথা বলি। নানা কারণে পশ্চিমবঙ্গের জন্যে যে সীমানা দেগে দেওয়া হয়েছে তার অভ্যন্তরে স্বভাবতই বাঙলা ভাষা প্রধান। কিন্তু আধুনিক কালে যে-কোনো দেশে একটি ভাষা প্রধান হলেও সেইটেই একমাত্র ভাষা নয়। পশ্চিম বাঙলার মধ্যেও নানান ভাষার কলধ্বনি। ১৯৫১ সালের গণনায় এক পশ্চিমবঙ্গের মধ্যেই মোট ১১৭টি ভাষাকে গণনার অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল। এর মধ্যে বাঙলা সমেত ভারতীয় সংখ্যা ৭৭; এশিয়ার অন্যান্য দেশের ভাষা ১৮; অন্যান্য মহাদেশের ভাষা ২০।

প্রতি ১০ হাজার লোকের মধ্যে ৮,৪৬২ জনের মাতৃভাষা বাঙলা। মাত্র ৯৬ জন এশিয়ার বাইরেকার ভাষা বলেন, তার মধ্যে ইংরেজী বলেন ১৫ জন। এশিয়ার অন্যান্য দেশের ভাষা ১০ হাজারে মাত্র ৪ জন, তার মধ্যে ২·৩ জন চীনাভাষী। ১০ হাজারে ১১৮ জন উপজাতীয় ভাষা বলে এবং ১,৪০০ জন বলে ৭৬টি ভারতীয় ভাষা। এর মধ্যে হিন্দীভাষীরাই সংখ্যায় বেশী; ৬৩৫ জন; সাঁওতালী ভাষা বলেন ১০ হাজারে ২৬৭ জন। নিচে প্রধান প্রধান ভাষার হিসেবে দেওয়া হল:

(১২)

ভাষা	পুরুষ	নারী
বাঙলা	১,১০,১৫,৭৪১	৯৯,৭৮,৬৩৩
হিন্দী	১০,৬৭,২৭৪	৫,০৭,৫১২
সাঁওতালী	৩,৩৬,০৬৫	৩,২০,৪৩৮
উর্দু	২,৮৯,৭০০	১,৬৭,৯৩৫
উড়িয়া	১,৪০,৫৫০	৪১,৭২১
নেপালী	৯০,০০৮	৮৪,০০৯
তেলেগু	২৭,৩৪১	২২,১৯৮
ইংরেজী	২৩,১৮৬	১৪,৯৭৯
গুরুমুখী	২২,৯৮৪	১০,৩৪১
গুজরাতী	৬,৮৬৩	৮,১০৮
তামিল	৯,৬৭৫	৫,০৩৫
অসমিয়া	৬,৬৮৩	২,৭০৪
রাজস্থানী	২,৩৮৮	৬,০০৭
মারাঠী	৪,৩০২	৩,৩৩৮
পাঞ্জাবী	৪,১৭৭	১,৫৩৪
মাড়োয়ারী	৩,৯০০	১,২৫৩

এই প্রসঙ্গে বাঙলা দেশের বর্তমান সীমানা ছাড়িয়ে আশেপাশেও একটু তাকিয়ে দেখা যেতে পারে। প্রধানত রাষ্ট্রীয় কারণে বাঙলা দেশের সীমানাটা বর্তমান আকারে আমাদের হাতে এসে পৌঁচেছে। এর পূর্বে একটা অংশের প্রধান ভাষা বাঙলা হলেও তা ভিন্ন রাষ্ট্র হয়ে আছে। কিন্তু পূর্ববঙ্গ ছাড়াও বাঙলা দেশের সীমানা বাঙলা ভাষার সীমানা অনুসারে এখনো সম্পূর্ণ পুনর্গঠিত হয় নি। পরের পৃষ্ঠায় পশ্চিম বাঙলার পার্শ্ববর্তী বিভিন্ন অঞ্চলের বিভিন্ন ভাষাভাষীর একটা হিসাব (১৯৩১ সালের আদম সুমারী অনুসারে) দেওয়া হল।

মহকুমা	জেলা	মোট জনসংখ্যার অনুপাতে বাঙলা-ভাষীর শতকরা হিসাব		মোট জনসংখ্যার অনুপাতে হিন্দুস্তানী-ভাষীর শতকরা হিসাব		বাঙলা হিন্দি ছাড়া অন্যান্য ভাষা বাদে মাতৃভাষা
		বাঙলা মাতৃভাষা	বাঙলা অতিরিক্ত ভাষা	হিন্দুস্থানী মাতৃভাষা	হিন্দুস্থানী অতিরিক্ত ভাষা	
ধলভূম (জামসেদপুর সহ)	সিংভূম	৩৫'৭৬	২১'৪৪	১২'৫৬	৫'৭৫	৫১'৬৬
ধলভূম (জামসেদপুর বাদে)	,,	৩৯'৬৮	২৬'৬৪	৪'১৫	১'২৫	৫৬'১৭
মানভূম, সদর	মানভূম	৮১'১৫	৫'৮৪	৪'৮৩	০'৫৪	১৪'০২
ধানবাদ	,,	৩৩'৭৮	১'৫৪	৪৯'৭৮	২'৫২	১৬'৪৪
জামতাড়া	সাঁওতাল পরগণা	২৯'৯৭	২০'৬২	২৮'৮৫		৪১'১৮
ডুমকা	,,	৯'৮৮	৫'১৭	৩৮'৪৯	০'০৭	৫১'৬৩
পাকুড়	,,	২৪'৯৬	০'৬২	১৬'১৩	০'৩৭	৫৮'৯১
রাজমহল	,,	১২'৯৭	২'১০	৩৭'০২	৩'০৭	৫০'০১
কিষেণগঞ্জ	পুর্নিয়া	১০'৬০	০'২৮	৮৮'১৪	০'৮১	১'২৬
পুর্নিয়া সদর	,,	৭'৮০	০'০৮	৮৭'৬৪	৪'৫৬	২'১৭

● উপসংহার

পশ্চিম বাঙলার লোকসংখ্যাকে আমরা নানান কোণ থেকে নানা রকমে বিচার করার চেষ্টা করলাম। তা থেকে শুধু একটা ছবিই যে ফুটে উঠল তা নয়, একটা গতিও ইতিমধ্যে পরিষ্কার হয়ে এসেছে। কোনো দেশ কোনো জনসমষ্টি কখনো একই জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকে না। তা বাড়ে অথবা কমে। একটা জায়গা থেকে আর-একটা জায়গায় যায়। একটা রূপ থেকে আর-একটা রূপে বিকশিত হয়ে উঠতে থাকে। জনতত্ত্বের বিজ্ঞান অনুসারে এই হয়ে ওঠা, এই পরিবর্তনের এক-একটা ধারা, এক-একটা নিয়ম প্রকাশ পায়। মনে আমাদের যে স্বপ্নই থাক, পশ্চিম বাঙলাকে নিয়ে যে কল্পনাই করি, এই বাস্তব গতিধারা আর নিয়মকে না মানলে, সে কল্পনা শুধু কল্পনাই থেকে যাবে, দেশ এগিয়ে অথবা পিছিয়ে যাবে অন্য কোনো একটা পরিণতিতে।

পশ্চিম বাঙলার ক্ষেত্রে এই বাস্তব গতিগুলি কি ?

দেখা গেল অতীতে বাঙলার সমাজদেহের মধ্যে যে এক ধরনের সামঞ্জস্য ছিল তা ভেঙে গিয়ে নতুন কয়েকটি প্রবণতা ক্রমাগত বৃদ্ধি পেতে শুরু করেছে। নতুন রকমের কয়েকটা অসামঞ্জস্য মাথা চাড়া দিয়ে উঠছে। এমনি একটি অসামঞ্জস্য হল গ্রামাঞ্চল আর শহরাঞ্চলের অসামঞ্জস্য। গ্রাম আর শহরে তফাত বেড়ে যাচ্ছে ভয়ানক ভাবে।

দ্বিতীয়ত দেখা গেল, জনসমষ্টি বলতে এক ধরনের পিণ্ডাকার একটা কিছু নয়। এ জনসমষ্টি দুটো স্পষ্ট ভাগে ভাগ হয়ে আছে ; একটা কৃষিবিষয়ক ভাগ, আর একটা অকৃষি বা শিল্প

বিষয়ক ভাগ। প্রকৃতির ওপর নির্ভর করে থাকলে এই কৃষিনির্ভর জনসংখ্যার মধ্যে সমস্যা বাড়তেই থাকবে। তাদের লোকধারণের ক্ষমতা প্রায় নিঃশেষ। বাড়তি জনসংখ্যা মাঝে মাঝেই রোগ-মহামারীতে মরতে থাকবে।

স্বভাবের ওপর নির্ভর করে থাকলে শিল্পবিষয়ক ভাগেরও ভবিষ্যৎ সংকীর্ণ। তার লোকধারণের ক্ষমতা শেষ হবার কথা নয়, তবুও শিল্প যা হচ্ছে, তা হয়েছে এবং এখনো হচ্ছে কুটির শিল্পের ধ্বংসের ওপর, অনিয়ন্ত্রিত, একপেশে রকমের। তাতে যত পরিমাণ লোক কাজ পাচ্ছে, তার চেয়ে অনেক বেশী লোক কাজ পাচ্ছে না। দুর্দশা বাড়ছে।

তৃতীয়ত এবং প্রধানত, সমাজটা শুধু কয়েকটা বৃত্তিতে ভাগ হয়ে নেই, ভাগ হয়ে আছে কয়েকটা শ্রেণীতে, যাদের মধ্যে কারো কারো স্বার্থ অন্য অনেকের স্বার্থের পরিপন্থী হয়ে দেখা দিচ্ছে। কৃষির ক্ষেত্রে একদিকে রয়েছে মুষ্টিমেয় খাজনাভোগী, অন্যদিকে বিপুলসংখ্যক চাষী, ক্ষেত-মজুর। কৃষিক্ষেত্র থেকে খাজনাভোগী অংশ নিঃশেষে সরে না গেলে বাকি কৃষিজীবীদের দুরবস্থা লাঘবের ও তাদের মধ্যে উদ্যম সৃষ্টির আশা নেই।

শিল্পের ক্ষেত্রেও দেখা যাচ্ছে, একদিকে বিপুল পরিমাণ বিদেশী স্বার্থ, একচেটিয়া স্বার্থ, অন্যদিকে একপেশে শিল্পবিস্তার এবং বেকারি ও ক্রমবর্ধমান সংঘাত।

চতুর্থত, অতি প্রাচীনকাল থেকে ধর্ম ও জাতির যে বিভেদটা আমাদের এখানে ছিল তা এখনো দূর হয়ে যায় নি। জাতির কোঠায় যে যত নিচে, অর্থনীতির কোঠায় এখনো তারাই তত নিচে।

পঞ্চমত, আমাদের সমাজটা আরো একটা প্রাচীন অসামঞ্জস্যে পীড়িত হচ্ছে : পুরুষের তুলনায় নারীর পশ্চাৎপরতা ও অর্থনৈতিক পরনির্ভরতা।

পশ্চিম বাঙলাকে সোনার বাঙলা বললেও কিন্তু এই দুর্দশার চক্রগুলি থেমে থাকবে না, তা আবর্তিত হয়ে চলতেই থাকবে, যদি না তাদের প্রকৃতি বুঝে যোগ্য ব্যবস্থা করে এখন থেকেই তার প্রতিবিধান করা যায়। যেমন গ্রামাঞ্চলের দুরবস্থা দেখে আমরা যদি বলতে থাকি, গাঁয়ে ফিরে যাও, গাঁয়েই মঙ্গল—তাহলে কিছু হবে না। কারণ গ্রামাঞ্চলের অবস্থাটা তো লোকের ইচ্ছা-অনিচ্ছার ওপর নির্ভর করছে না, নির্ভর করছে মূল একটা কারণের ওপর ; কৃষি উৎপাদন আটকে পড়ে আছে। খাজনাভোগী ও অলস উপস্বত্বভোগীদের সরিয়ে দিয়ে, যথাযোগ্য সেচ ইত্যাদি ব্যবস্থা করলে তার এই উৎপাদন বাড়বে— কৃষিতে আরো লোক ধরবে, লোকে আপনিই সেখানে যেতে থাকবে।

কৃষি থেকে চাপ কমাবার জন্যে কেউ কেউ হয়তো বলবেন, পশ্চিম বাঙলার জন্যে এখন দরকার শুধু যে-কোনো রকমের কিছু আধুনিক কারখানা। সে কারখানা যত হয় তত ভাল—তবে সংকট থামবে এমন ভরসা নেই। কারণ আমরা দেখেছি কারখানা বাড়লেও এখানে ধ্বংস হচ্ছে কুটির শিল্প এবং সৃষ্টি হচ্ছে বিপুল পরিমাণ বেকার। তাই শিল্প বিস্তার করতে চাইলে করতে হবে এমন ভাবে যাতে বেকারি না বাড়ে। তা করা যায়, যে-কোন রকমের শিল্প দিয়ে নয়—বিশেষ একরকমের শিল্পবিন্যাস দিয়ে—একদিকে ছোটো ছোটো শিল্প এবং অন্যদিকে মূল শিল্পকে যথাসাধ্য বাড়িয়ে তুলে। মূল শিল্প বাড়া মানে হল দেশের শিল্প-স্বাধীনতা

বাড়া। এবং তার সঙ্গে ছোটো ছোটো শিল্প গড়ার অর্থ হল বিপুল পরিমাণ কর্মসংস্থান। এই রকম পরিকল্পিত শিল্পায়ন হলেই ভবিষ্যতে একদিন আমাদের একপেশে শিল্প বিস্তারের বদলে সুসমঞ্জস শিল্পসমৃদ্ধি সম্ভব হবে। কৃষিতে চাপ সত্যই কমবে।

কিংবা যেমন তপশিলীদের অথবা নারীদের পশ্চাৎপরতা দূর করার জন্যে যদি আমরা তাদের সামাজিক সমানাধিকার ঘোষণা করে কেবল কয়েকটা শ্রুতিসুখকর আইন করি তাহলেই কাজ সম্পূর্ণ হল এমন মনে হয় না। কারণ আগে দেখেছি তাদের সামাজিক পশ্চাৎপরতা মিশে আছে তাদের অর্থনৈতিক অধিকার-হীনতার সঙ্গে। তাই এদের টেনে তুলে সমান করতে হলে ব্যবস্থা করতে হবে যাতে তাদের জন্য যথেষ্ট পরিমাণে এবং সব রকমের কাজ ও শিক্ষার সুবিধা থাকে।

পরিশেষে যদি আমরা চাই আমাদের দেশটা দ্রুত অগ্রসর হয়ে যাক, তাহলে জেনে রাখতে হবে যে তা নির্ভর করছে এমন সব লোকেদের ওপর যারা গড়ে তুলছেন, উৎপাদন করছেন। তা নির্ভর করছে প্রধানত আমাদের দেশের শ্রমিক ও কৃষকের ওপর। যদি চাই তাদের সৃষ্টিক্ষমতা বাড়ুক, উন্মাদনা জাগুক; তাহলে দেখতে হবে এই শ্রমিক এবং কৃষকেরা যেন দেশের উন্নতিতে তাদের ন্যায্য ভাগ পায়, নিজেদের ভাগ্য সম্পর্কে তারা যেন সন্তুষ্টবোধ করতে পারে। সামাজিক মুক্তিকে নিশ্চিত করতে হবে অর্থনৈতিক মুক্তি দিয়ে।

জনতত্ত্বের এক ধরনের পণ্ডিত আছেন, তাঁরা কিন্তু এই সব মূল গতিধারা ও নিয়মগুলোকে না বুঝে না মেনে মনগড়া এক একটা ফতোয়া দিয়ে থাকেন। যেমন, পাশ্চাত্ত্য দেশের উঁচু

মহলে আজকাল একটা কথা খুব চালু করা হচ্ছে যে আসলে জনসংখ্যা বৃদ্ধিটাই নাকি সব উপসর্গের মূল। একটা দেশ যদি তার জনসমষ্টিকে মানুষের মতো খাওয়াতে পরাতে না পারে তবে তার সোজা প্রতিবিধান হল নাকি জনসমষ্টিকে কমিয়ে দেওয়া। এ মতটা তাঁরা আবার বিশেষ করে ভারত-সমেত এশিয়া-আফ্রিকার দেশগুলোর ওপর চাপাতে চাইছেন। এশিয়া ও আফ্রিকার দেশগুলিতে যদি ভয়াবহ দারিদ্র্য দেখা যায়, তবে তার কারণ নাকি এই সব দেশে সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থের শোষণ নয়—কারণ হল এই সব দেশের অস্বাভাবিক লোকবৃদ্ধি ও অতিপ্রজতা।

এই মত প্রথম প্রচার করেছিলেন অর্থনীতিবিদ ম্যালথাস্। সম্প্রতি ভোগট প্রভৃতি পাশ্চাত্ত্য লেখকেরা সজোরে এই মতটাকেই আবার নতুন করে চালু করছেন। দুঃখের কথা এই যে, এদেশেও কিছু কিছু প্রভাবশালী মহলেও তার প্রতিধ্বনি শোনা যাচ্ছে।

পশ্চিম বাঙলার ক্ষেত্রে তত্ত্বটাকে বিচার করে দেখা যাক।

●সংকট না সম্পদ ?

পশ্চিম বাঙলার দারিদ্র্য-দুর্দশার কারণ কি তার অস্বাভাবিক লোকবৃদ্ধি ? তাহলে দেখা যাক পশ্চিম বাঙলার সত্যি সত্যিই লোকবৃদ্ধির হারটা কি রকম। প্রথমত ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশের তুলনায় পশ্চিম বাঙলার লোকবৃদ্ধির হার মোটেই বেশী নয়। ১৯৪১-৫১ সালের হ্রাসবৃদ্ধির গড় হার নিলে দেখা যাবে পশ্চিম বাঙলায় এ হার যেখানে +১২.৭, সেখানে আসামে +১৭.৪, মহীশূরে +২১.২, বোম্বাইয়ে +২০.৮, মাদ্রাজে+১৩.৪, উত্তর প্রদেশে ১১.২, বিহারে ৯.৬।

কিন্তু ভারতবর্ষের এই লোকবৃদ্ধির হারটাই কি অস্বাভাবিক? তাও নয়। ১৯৪৫ সালে দুর্ভিক্ষ কমিশন মন্তব্য করেছেন ১৮০২ থেকে ১৯৩১ এই ষাট বছরে ভারতের লোকসংখ্যা বেড়েছে শতকরা ৩০। এটা মোটেই অস্বাভাবিক নয় কেননা ঠিক ঐ সময়েই ইংলণ্ড ও ওয়েলস্-এর জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার এর দ্বিগুণেরও বেশী—শতকরা ৭৭।

কিংসলি ডেভিড তাঁর গ্রন্থে বলেছেন ১৮৭১ থেকে ১৯৪১ সন পর্যন্ত ভারতবর্ষের বার্ষিক বৃদ্ধির গড় প্রায় ০.৬০। এ হার মোটেই বেশী নয় কারণ ১৮৫০ থেকে ১৯৪০ সন পর্যন্ত পৃথিবীর লোকবৃদ্ধির গড় হার এর চেয়েও কিছু বেশী—০.৬৯। আর উত্তর আমেরিকা ইওরোপ প্রভৃতি দেশে এ হার আরো বেশী। ১৮৭১ থেকে ১৯৪১ এই সত্তর বছরে ভারতের লোকবৃদ্ধি শতকরা ৫২। এই একই সময়ে ব্রিটিশ দ্বীপপুঞ্জে লোক বেড়েছে শতকরা ৭৯। ১৮৭০-১৯৪০ এই সত্তর বছরে জাপানের বৃদ্ধি তো একেবারে ১২০ এবং আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে ২৩০%।

১৮৮১ থেকে ১৯৪১ এই ষাট বছরে গ্রেট ব্রিটেনের লোকবৃদ্ধি শতকরা ৫৬.৯, ভারতবর্ষে ৫৫.৫ (কিংসলি ডেভিডের হিসাবমতো আরো কম—৫১.১) আর পশ্চিমবঙ্গে মাত্র ৪৫.৭। ১৯২১ থেকে ভারতে লোকবৃদ্ধির গড় হার ১.২%, ১৯২০-৩০ দশকে যুক্তরাষ্ট্রের গড় হার ১.৬%। এত বৃদ্ধি ভারতে কখনো হয় নি।

এই সব তথ্য থেকে নিশ্চয় করেই বলা যায় যে ভারতে জন সংখ্যার অতিবৃদ্ধির যে অভিযোগটা করা হয় তা একান্তই ভিত্তিহীন। দ্বিতীয়ত লোকসংখ্যা বৃদ্ধিই যদি দারিদ্র্যের কারণ হয় তবে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রকে সবচেয়ে দরিদ্র হতে হত, কারণ লোকবৃদ্ধির হার সেখানেই সব চেয়ে বেশী।

ম্যালথাসের তত্ত্বে আর একটা কথা বলা হয় যে, লোক যে পরিমাণে বাড়ে, জমির ফসল অর্থাৎ খাদ্য উৎপাদন নাকি সে পরিমাণে বাড়তে পারে না। কৃষিকে বর্তমান অবস্থায় রেখে দিলে একথা ঠিক হতে পারে হয়তো, কিন্তু কৃষিকে স্থাণু বলে কেনই বা ধরব? যোওয়াদা কাস্ত্রো নামক একজন লেখক সম্প্রতি তাঁর বিখ্যাত বই 'বুভুক্ষার ভূগোল'-এ দেখিয়েছেন যে পৃথিবীর চাষযোগ্য জমির আট ভাগের একভাগ মাত্র এ পর্যন্ত চাষ হয়েছে। সুতরাং চাষের জমি বাড়িয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা এখনো অনেক। বিজ্ঞান আজ যে পরিমাণ উন্নতি করেছে, তাতে মেরু ও মরু অঞ্চলেও চাষ করা সম্ভব। খাদ্য শুধু জমি থেকে নয়, সমুদ্র থেকেও আহরণ করা চলে। বিজ্ঞানের উন্নতির ফলে বর্তমানে যে জমি চাষ হয় তা থেকেই মানুষ পিছু ফসলের উৎপাদন শতকরা দেড় ভাগ বাড়বে, অন্যদিকে পৃথিবীর জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার মাত্র শতকরা এক। তাই ম্যালথাস তত্ত্বের প্রকৃত কোনো ভিত্তি নেই।

সেনসাস-অধিকর্তা অশোক মিত্র-প্রণীত সরকারী বিবরণীতে এ প্রসঙ্গে বিশদ আলোচনা করে দেখানো হয়েছে যে আসলে যে সব দেশ অনুন্নত, লোকবৃদ্ধির হার সেখানেই বরং কম। ১৭৫০-১৯০০ এই দেড়শ বছরে এশিয়া আফ্রিকা প্রভৃতি দেশে লোকবৃদ্ধি যে বেশ কম ছিল তা নানা পরিসংখ্যান থেকে দেখা গেছে। অথচ ঠিক এই দেড়শ বছরেই ইওরোপে শিল্পবিপ্লব শুরু হয়েছে। প্রচুর কলকারখানা তৈরি হতে শুরু করেছে। এবং শিল্পবিপ্লবের ঠিক এই সময়টাতেই ইওরোপে লোকবৃদ্ধি হয় অসাধারণ রকম।

আমাদের দেশে যদি লোকবৃদ্ধির হার এত কম হয়ে থাকে তবে আশা করা উচিত, এদেশে শিল্পবিস্তার এবং উৎপাদন বৃদ্ধির

সঙ্গে সঙ্গে সে হার আরো বাড়বে, এবং তাতে আতঙ্কের কিছু নেই। কারণ উৎপাদনের পক্ষে একটি দেশের লোকসংখ্যা বাধা নয়, বরং ঠিক ভাবে কাজে লাগাতে পারলে তারাই হল উৎপাদনের প্রধান শক্তি। পশ্চিম বাঙলার সংকট যদি কোথাও থাকে তবে তা তার সংখ্যায় নয়, তার আটকা-পড়া উৎপাদনশক্তির মধ্যে। সংকট সমাধানের পথ তাই উৎপাদন-শক্তিকে অবিলম্বে জাগিয়ে তোলা।'

● সোনার বাঙলা

সোনার বাঙলায় আজ যদি আর কোথাও সোনা না থেকে থাকে তবে সে সোনা আছে তার এই লোকসম্পদের মধ্যে, তার আড়াই কোটি মানুষের বাহুতে।

এই আড়াই কোটি মানুষের পাঁচ কোটি হাত যদি উপযুক্ত কাজে লাগার সুযোগ পায়, তবে সারা দেশ সত্যি করে ধনে ধান্যে পূর্ণ হয়ে উঠতে পারে। সোনার বাঙলাকে যাঁরা ভালোবাসেন, নতুন বাঙলা যাঁরা গড়তে চান তাঁদের দেখতে হবে যাতে এই মানুষকে সবচেয়ে মূল্যবান মনে করে এগুতে পারি—এমন পরি-কল্পনা নিতে পারি যাতে আগে যা বলেছি সেই সব অসামঞ্জস্য ক্রমে ক্রমে দূর হয়ে কলে কারখানায়, ক্ষেতে, কুটির শিল্পে, শিক্ষা-দীক্ষায় এদেশ সত্যিই হয়ে উঠবে "ভুবনমনোমোহিনী", সত্যি করেই লোকে অনুভব করবে,

'ওগো মা, তোমায় দেখে দেখে আঁখি না ফিরে
তোমার দুয়ার আজি খুলে গেছে সোনার মন্দিরে।'

	উদ্বাস্তু নন এমন পাকিস্তানী	নেপাল ও সিকিম	পৃথিবীর অন্যান্য দেশ থেকে যারা এসেছেন			
	১৯৫১	১৯৫১	১৯৫১			১৯২১
			পুরুষ	নারী	মোট	
পশ্চিম বাঙলা	৫,১৯,৮৬৭	৯৫,৫৮৬	১৬,২৬০	১০,৪৪৪	২৬,৭০৪	১,০৮,৯৯০
বর্ধমান	১২,৭৪৫	১,৭১০	৫৭১	৩০৮	৮৭৯	৯৮০
বীরভূম	৩,১০৪	১৩৮	৩১	১৮	৪৯	৬০
বাঁকুড়া	১,২৩২	৫৬	৭	১৮	২৫	২০
মেদিনীপুর	২,৮০৯	১,০৭৫	৬২	৪৪	১০৬	১৬০
হুগলী	২০,৮৮১	২৯০	২০৬	১৪৪	৩৫০	৭০০
হাওড়া	৩২,৭০৫	১,৪৪১	৭৯৫	১৯৮	৯৯৩	১,৩০০
২৪ পরগনা	৯৩,৯৬৫	২,৬০৪	১,৩৪৪	৮৪০	২,১৮৪	৩,১৫০
কলকাতা	২,৫২,৪৪৪	১০,৮৩১	৯,৫৩২	৬,৩৭৬	১৫,৯০৮	১৩,৮০০
নদীয়া	১৪,৯৬৭	২১৩	৫১	৪১	৯২	৬০
মুর্শিদাবাদ	৫,০৩২	৫৪	৪৩	২০	৬৩	৬০
মালদহ	৩,৯৩৫	৬৬	৮	৮	১৬	৭০
পশ্চিম দিনাজপুর	১৩,২৭০	৭৪২	৭	৪	১১	২৫০
জলপাইগুড়ি	৩৩,৭৮৬	২৬,৮৬৩	১,১৯৫	৫৭০	১,৭৬৫	২৫,১৯০
দার্জিলিঙ	৬,৮৬৩	৪০,৪০৬	২,৩৮৮	১,৮২৯	৪,২১৭	৬২,৪৪০
কোচবিহার	২২,১২৯	৯,০৯৭	২০	২৬	৪৬	৭৫০

পরিশিষ্ট (খ) : পশ্চিমবঙ্গে ভারতের অন্যান্য রাজ্যের নাগরিক এবং অন্যান্য রাজ্যে বাঙালী

	পশ্চিম বাঙলায় অবাঙালী বহিরাগত (হাজার)	পঃ বঙ্গ থেকে অন্য রাজ্যে যাঁরা গেছেন (হাজার)	মোট বাঙলাভাষী (হাজার)
বিহার	১,১০৯	১৩৭'৪	১,৭৫৯'৭
উত্তর প্রদেশ	২৯৫	৪৯	৭৩
উড়িষ্যা	২০২	৩৪	৮৬
রাজস্থান	৫৬	২'১	২'৮
মাদ্রাজ	৫২	৩'৭	৩'৪
পাঞ্জাব	৩৮'৪	৪	১
মধ্যভারত	৩৮	১'৬	১'৫
বোম্বাই	১৩'৭	১৪	১৫'৬
সৌরাষ্ট্র	৫'৫	'৯	'৫
দিল্লী	৩	৬	১০'৩
ত্রিবাঙ্কুর-কোচিন	২'৩	'২৫	...
বিন্ধ্যপ্রদেশ	২	'৫	'৭
হায়দ্রাবাদ	২	১	'৮
মধ্যপ্রদেশ	২'৪	১৯'৫	২৩'৮
পেপসু	১	'৬	'৫
ত্রিপুরা	'৬	৩	...
মহীশূর	'৫	১'৫	২'৪
আসাম	১৯'৬	২৩'৫	১,৭১৯
আজমীর	...	'৩	'৬

পরিশিষ্ট (গ): পশ্চিমবঙ্গের আয়তন ও লোকসংখ্যা

জেলা	আয়তন বর্গমাইল সার্ভেয়ার জেনারেলের হিসাবে	লোকসংখ্যা	
		১৯৫১	১৯০১
২৪ পরগনা	৫,২৯২'৮	৪৬,০৯,৩০৯	২১,৫৫,৯৮১
মেদিনীপুর	৫,২৫৮'৫	৩৩,৫৯,০২২	২৭,৮৯,১১৪
কলিকাতা	৩২'৩	২৫,৪৮,৬৭৭	৯,২০,৯৩৩
বর্ধমান	২,৭১৫'৯	২১,৯১,৬৬৭	১৫,২৮,২৯০
মুর্শিদাবাদ	২,০৯৭'৫	১৭,১৫,৭৫৯	১৩,২২,৪৮৬
হাওড়া	৫৬৮'২	১৬,১১,৩৭৩	৮,৫০,৫১৪
হুগলী	১,২০৯'২	১৫,৫৪,৩২০	১০,৪৯,০৪১
বাঁকুড়া	২,৬৫৭'৭	১৩,১৯,২৫৯	১১,১৬,৪১১
নদীয়া	১,৫২৭'২	১১,৪৪,৯২৪	৭,৭৩,২০২
বীরভূম	১,৭৫৪'২	১০,৬৬,৮৮৯	৯,০৬,৮৯১
মালদহ	১,৪০৭'৯	৯,৩৭,৫৮০	৬,০৩,৬৪৯
জলপাইগুড়ি	২,৩৭৮'৩	৯,১৪,৫৩৮	৫,৪৪,৯০৬
প. দিনাজপুর	১,৩৮৪'৮	৭,২০,৫৭৩	৪,৫৬,৫০১
কোচবিহার	১,৩৩৪'১	৬,৭১,১৫৮	৫,৬৬,৯৭৪
দার্জিলিঙ	১,১৫৯'৭	৪,৪৫,২৬০	২,৪৯,১১৭
	৩০,৭৭৫'৩	২,৪৮,১০,৩০৮	২,০৭,৫৬,৬৮০

পরিশিষ্ট (গ ২) : পশ্চিমবঙ্গে লোকসংখ্যার হ্রাসবৃদ্ধি

	১৯৫১	১৯৪১	১৯৩১	১৯২১	১৯১১	১৯০১	১৮৯১
মোট জনসংখ্যা	২৪৮১০৩০৮	২০৭৫৬৬৮২	১৭৬৬৩৪২৭	১৬৫০০৮৩৭	১৬৭৯২৮০০	১৫৮৩৪০১০	১৪৬৪৯৮৫০
বহিরাগত	৪৬০০৬৭২	১৭২৯৮২০	১৪৭৭৯০৫	১৪৬০০৫৪	১৪২৮০৭৫	১০৪৫৩১৪	৬৮৭৬৬২
বিদেশগামী	৩১১১১৬	১৮৫৭৫৩	১৫৫৭৮১	১৯১২০০	২৬২০১০	৬৬১২১	১০১৩০৫
নীট বা স্বাভাবিক জনসংখ্যা	২০৫২০৭৫২	১৯২১২৬১৫	১৬৩৪১৩০৩	১৫১৩১০৮৩	১৫৬২৬৭৩৫	১৪৮৫৪৮১৭	১৪০৬৩৪৯৩
শতকরা হ্রাসবৃদ্ধি	+৬.৮	+১৭.৬	+৮.০	−৩.২	+৫.২	+৫.৬	

পরিশিষ্ট (ঘ) : ভারতের বিভিন্ন রাজ্যের আয়তন ও লোকসংখ্যা

রাজ্য	বর্গমাইলে লোকসংখ্যা	বর্গমাইলে আয়তন	লোকসংখ্যা
আসাম	১০৬	৮৫,০১২	৯০,৪৩,৭০৭
মধ্যপ্রদেশ	১৬৩	১,৩০,২৭২	২,১২,৪৭,৫৬৩
উড়িষ্যা	২৪৪	৬০,১৩৬	১,৪৬,৪৫,৯৪৬
মহীশূর	৩০৮	২৯,৪৮৯	৯০,৭৪,৯৭২
বোম্বাই	৩২৩	১,১১,৪৩৪	৩,৫৯,৫৬,১৫০
পাঞ্জাব	৩৩৮	৩৭,৩৭৮	১,২৬,৪১,২০৫
মাদ্রাজ	৪৪৬	১,২৭,৭৯০	৫,৭০,১৬,০০২
উত্তর প্রদেশ	৫৫৭	১,১৩,৪০৯	৬,৩২,১৫,৭৪২
বিহার	৫৭২	৭০,৩৩০	৪,০২,২৫,৯৪৭
পশ্চিম বঙ্গ	৮০৬	৩০,৭৭৫	২,৪৮,১০,৩০৮
ত্রিবাঙ্কুর কোচিন	১০১৫	৯,১৪৪	৯২,৮০,৭২৫

পরিশিষ্ট (ঙ ১): পশ্চিমবঙ্গের প্রতি বর্গমাইলে ঘনতা

		১৯৫১	১৯৪১	১৯৩১	১৯২১	১৯১১	১৯০১	১৮৯১	১৮৮১	১৮৭২
পশ্চিম বঙ্গ	মোট	৭৯৯	৭০৩	৫৯৬	৫২৮	৫৪১	৫১০	৪৭২	৪৪৬	৪৩৮
	গ্রাম	৬১০	৫৬২	৪৮৫	৪৫৬	৪৭৪	৪৫২	৪২২	৪০২	৩৯৫
	শহর	১৩,৬৩২	১০,২৮১	৬,২৬৬	৫,৪৪৫	৫,০৮১	৪,৪৬০	৩,৮৩৭	৩,৩৮৬	৩,৪১১
বর্ধমান ডিভিশন	মোট	৭৮৬	৭২৯	৬১৩	৫৭০	৬০০	৫৮৪	৫৪৫	৫২৪	৫৩৯
	গ্রাম	৬৮১	৬৩৬	৫৬২	৫২৯	৫৬৩	৫৫২	৫১৮	৫০১	৫১৩
	শহর	৯,০৩৭	৭,১৭৩	৪,৫৮৩	৩,৭৯২	৩,৪৫৮	৩,০৮৪	২,৬৬৮	২,৩৩৫	২,৫৪৮
বর্ধমান	মোট	৮১০	৬৯৯	৫৮২	৫৩০	৫৬৭	৫৬৫	৫১৪	৫১৪	৫৪৮
	গ্রাম	৭০০	৬২৫	৫৪২	৫০২	৫৪০	৫৪১	৪৯৬	৪৯৬	৫২১
	শহর	৮,৩২৮	৫,৭৩৭	৩,৩৯৯	২,৪৬১	২,৪২১	২,২৩০	১,৭৯৪	১,৭৪৭	২,৪১৬
বীরভূম	মোট	৬১২	৬০১	৫৪৪	৪৮৯	৫৩৯	৫২০	৪৫৮	৪৫৬	৪৯০
	গ্রাম	৫৭৭	৫৭২	৫৩৬	৪৭৯	৫৩৯	৫২০	৪৫১	৪৫৫	৪৮৯
	শহর	৪,৭৯১	৪,১৯০	১,৪৫০	১,৬১৫	৬৩৪	৬০৪	৫২০	৫৪৫	৬২৫
বাঁকুড়া	মোট	৪৯৮	৪৮৭	৪২০	৩৮৫	৪৩০	৪২২	৪০৪	৩৯৪	১৬৬
	গ্রাম	৪৬৭	৪৫৭	৩৯৮	৩৬৬	৪১২	৪০৫	৩৮৯	৩৮১	১৫২
	শহর	৩,৮৭৮	৩,৭৭০	২,৭৫৬	২,৪৯৫	২,৩৪৪	২,১৮৩	২,০৬৫	১,৭৭০	১,৮৮৪
মেদিনীপুর	মোট	৬৩৯	৬০৭	৫৩৩	৫০৮	৫৩৭	৫৩১	৫০১	৪৭৯	৪৮৫
	গ্রাম	৫৯৭	৫৭৭	৫১১	৪৯৪	৫২৩	৫১৭	৪৮৮	৪৬৮	৭৭১
	শহর	৫,১০৯	৩,৭৯৯	২,৮০০	১,৯৫৭	২,৯৫৮	১,৮১৬	১,৮১৬	১,৬৫১	১,৮৮৬

		১৯৫১	১৯৪১	১৯৩১	১৯২১	১৯১১	১৯০১	১৮৯১	১৮৮১	[illegible]
হুগলী	মোট	১,২৮৬	১,১৪০	৯২২	৮৯৪	৯০২	৮৬৮	৮৫৬	৮৩৮	৯৫৮
	গ্রা	১,০৩০	৯৩২	৭৭৫	৭৬৭	৭৯৯	৭৭৯	৭৭৫	৭৭০	৮৯০
	শ	১০,১১৫	৮,২৯৬	৫,৯৭০	৫,২৫৯	৪,৪৪২	৫,৯২৬	৩,৬৩০	৩,১৯৮	৩,২৯৭
হাওড়া	মোট	২,৮৭৭	২,৬৬১	১,৯৬২	১,৭৮১	১,৬৮৫	১,৫১৯	১,৩৬৩	১,১৩৪	১,০৬৪
	গ্রা	২,০০৪	১,৯৫১	১,৫৫২	১,৪৩৩	১,৩৬৫	১,২৪১	১,১১৬০	৯৭৫	৯১৬
	শ	৩১,৪৬৫	২৫,৮৮৫	১৫,৩৭৫	১৩,১৬৩	১২,১৩৩	১০,৬১৮	৮,০৩০	৬,৩৬৫	৫,৮৯১
প্রেসিডেন্সী ডিভিসন	মোট	৮১০	৬৮২	৫৩৩	৪৯৩	৪৯২	৪৪৯	৪১১	৩৮১	৩৫৫
	গ্রা	৫৫০	৪৯১	৪২১	৩৯৪	৩৯৯	৩৬৮	৩৪২	৩২০	২৯৫
	শ	১৬,৬২০	১২,৩০২	৭,৩৬০	৬,৫২১	৬,১৩৭	৫,৩৫৫	৪,৫৯৮	৪,০৭০	৩,৯৭২
২৪ পরগনা	মোট	৮১৭	৬৫১	৫১২	৪৬৮	৪৩৯	৩৮২	৩৫৩	৩২১	৩০১
	গ্রা	৫৯১	৫০৯	৪১৮	৩৮৮	৩৭০	৩৩৩	৩৬০	২৮৫	২৭২
	শ	৯,২৩০	৫,৮৯২	৪,০১৭	৩,৪১৯	৩,০১৭	২,১৯৬	১,৯৪৮	১,৬৩৬	১,৩৭৭
কলকাতা	শ	৭৮,৮৫৮	৬৫,২৫০	৩৫,২৯৯	৩১,৯২১	৩০,৮৭৯	২৮,৪৯৪	২২,৯৫৪	২০,০৬৫	২০,৭১২
নদীয়া	মোট	৭৫৯	৫৫৭	৪৭৮	৪৭২	৫১	৫১২	৫১২	৫৩৬	৪৯৫
	গ্রা	৬৩৩	৪৯০	৪৩০	৪২৭	৪৭১	৪৬৯	৪৬২	৪৮৩	৪৫০
	শ	৬,৯১৪	৩,৮৬৩	২,৮৫২	২,৬৫৩	২,৬৬১	২,৬৪৭	২,৯৮৪	৩,০৯৮	২,৭০২
মুর্শিদাবাদ	মোট	৮২৮	৭৯২	৬৬১	৫৯১	৬৪৯	৬৩৮	৬০৪	৫৯২	৫৮৬
	গ্রা	৭৭৩	৭৪৩	৬২৫	৫৫৬	৬১৭	৬০৯	৫৭২	৫৫৯	৫৪৬
	শ	৫,০৫৩	৪,৫১১	৩,৪৩৯	৩,২৯২	৩,১২৭	২,৮৪৩	২,৯৯৭	৩,১৩৪	৩,৬২১

পরিশিষ্ট (৬ ৩) : পশ্চিমঙ্গের প্রতি বর্গমাইলে ঘনতা

		১৯৫১	১৯৪১	১৯৩১	১৯২১	১৯১১	১৯০১	১৮৯১	১৮৮১	১৮৭২
মালদহ	মোট	৬৭৪	৬০৭	৫১৮	৪৯৩	৫০২	৪৩৪	৩৯৩	৩৩৮	৩২৩
	গ্রা	৬৫০	৫৮৮	৫০৫	৪৮২	৪৯০	৪২২	৩৮১	৩২৬	৩১১
	শ	১,৩৪২	৮,৭৬৭	৬,৩৫০	৫,৫৪৯	৫,৮৩০	৫,৬১৬	৫,৮০৫	৫,৫২৪	৫,৮৪৫
পশ্চিম দিনাজপুর	মোট	৫২০	৪২১	৩৭৮	৩৫৪	৩৬৮	৩২৯	৩০৬	২৯৪	২৯০
	গ্রা	৪৯২	৪১৮	...	...	...	...	...	...	...
	শ	৫,৫৯২	৯২৭	...	...	..	...	...	...	...
জলপাইগুড়ি	মোট	৩৮৫	৩৫৬	৩১১	২৯২	২৭৯	২২৯	১৮৩	১৩৩	৮৫
	গ্রা	৩৫৯	৩৪৬	৩০৪	২৮৭	২৭৫	২২৬	১৭৯	১৩০	৮২
	শ	৭,৬০৩	৩,১৯১	২,১৮০	১,৭০৩	১,৩৫২	১,১৮৩	১,১৭২	৯১২	৭৫৮
দার্জিলিঙ	মোট	৩৭১	৩১৪	২৬৬	২৩৬	২২১	২০৮	১৮৬	১২৯	৭৯
	গ্রা	২৯৬	২৬৮	২৩৩	২১৪	২০৩	১৯২	১৭৩	১২১	৭৭
	শ	৭,৩৮১	৪,৫৪৪	৩,৩৯৭	২,২৪২	১,৯২০	১,৬৭১	১,৩৮০	৮৬৩	২৪৭
কোচবিহার	মোট	৫০৭	৪৮৫	৪৪৭	৪৪৮	৪৪৮	৪২৯	৪৩৮	৪৫৬	৪০৩
	গ্রা	৪৭১	৪৬৬	৪৩৫	৪৩৬	৪৩৮	৪১৯	৪৩০	৪৫০	৩৯৯
	শ	১১,৬৭০	৬,২৩৮	৪,১৯৩	৪,০১৪	৩,৬৭৩	৩,২৭০	২,৬৭২	২,২১৭	১,৬৬২

পরিশিষ্ট (চ) : পশ্চিমবঙ্গে জেলাগুলির আয়তন ও লোকসংখ্যা

জেলা	বর্গমাইলে এলাকা	প. বাঙলার মোট কত অংশ %	জনসংখ্যা	প. বাঙলার মোট জনসংখ্যার কত অংশ %
বর্ধমান	২৭১৫'৯	৮'৮২	২১,৯১,৬৬৭	৮'৮৩
বীরভূম	১৭৫৪'২	৫'৭০	১০,৬৬,৮৮৯	৪'৩০
বাঁকুড়া	২৬৫৭'৭	৮'৬৪	১৩,১৯,২৫৯	৫'৩২
মেদিনীপুর	৫২৫৮'৫	১৭'০৯	৩৩,৫৯,০০২	১৩'৫৪
হুগলী	১২০৯'২	৩'৯৩	১৫.৫৪.৩২০	৬'২৬
হাওড়া	৫৬৮'২	১'৮৫	১৬,১১,৩৭৩	৬'৫০
কলকাতা	৩২'৩	...	২৫,৪৮,৬৭৭	১০'২৭
নদীয়া	১৫২৭'২	৪'৯৬	১১,৪৪,৯২৪	৪'৬১
মুর্শিদাবাদ	২০৯৪'৫	৬'৮১	১৭,১৫,৭৫৯	৬'৯২
মালদহ	১৪০৭'৯	৪'৫৭	৯,৩৭,৫৮০	৩'৭৮
প. দিনাজপুর	১৩৮৪'৮	৪'৫০	৭,২০,৫৭৩	২'৯০
জলপাইগুড়ি	২৩৭৮'৩	৭'৭৩	৯,১৪,৫৩৮	৩'৬৯
দার্জিলিঙ	১১৫৯'৭	৩'৭৭	৪,৪৫,২৬০	১'৭৯
কোচবিহার	১৩৩৪'১	৪'৩৩	৬,৭১,১৫৯	২'৭১
২৪ পরগনা	৫২৯২'৮	১৭'২০	৪৬,০৯,৩০৯	১৮'৫৮

পরিশিষ্ট (ছ) পশ্চিমবঙ্গে বিভিন্ন জেলায় কৃষিনির্ভরতার অনুপাত [ক-ঘনতা ॥ খ-কৃষিনির্ভরতার অনুপাত]
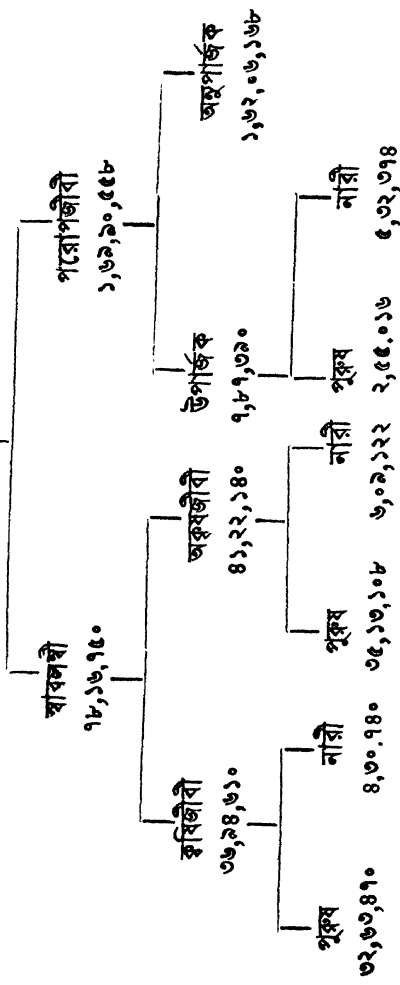
পরিশিষ্ট (জ) পশ্চিমবঙ্গে স্বাবলম্বী ও পরোপজীবী জনসংখ্যার হিসাব

	১৯৫১		১৯২১		১৯১১	
	ক	খ	ক	খ	ক	খ
পঃ বাঙলা	৬১০	৫৭২	৪৫৬	৬৮৩	৪৭৪	৬৭১
বর্ধমান বিভাগ	৬৮১	৬৭৪	৫২৯	৭১৮	৫৬৩	৭১৩
বর্ধমান	৭০০	৬২৬	৫০২	৬৮০	৫৪০	৬৭১
বীরভূম	৫৭৭	৮১৪	৪৭৯	৭৬৪	৫৩৯	৭৬২
বাঁকুড়া	৪৬৭	৮১৮	৩৬৬	৭৭০	৪১২	৭৩৮
মেদিনীপুর	৫৯৭	৮১৮	৪৯৪	৮৪০	৫২৩	৮১২
হুগলী	১০৩০	৫৬৮	৭৬৭	৬১৩	৭৯৯	৬৪১
হাওড়া	২০০৪	৩২৪	১৪৩৩	৪৬৬	১৩৬৫	৪৯১
প্রেসিডেন্সি বিভাগ	৫৫০	৪৯০	৩৯৪	৬৫০	৩৯৯	৬২৯
২৪ পরগনা	৫৯১	৫৩৪	৩৮৮	৬৭৪	৩৭০	৬৯০
নদীয়া	৬৩৩	৫৩৪	৪২৭	৬৭২	৪৭১	৬৬০
মুর্শিদাবাদ	৭৭৩	৬৯২	৫৫৬	৮২৪	৬১৭	৭০৭
মালদহ	৬১০	৭১২	৪৮২	৭৬৫	৪৯০	৬৫৮
প. দিনাজপুর	৪৯২	৮৫২	৩৫৪	৯১২	৩৬৮	৯১১
জলপাইগুড়ি	৩৫৯	৪৮৭	২৮৭	৭১৪	৭৭৫	২২০
দার্জিলিঙ	২৯৬	৩২১	২১৪	৪২৩	২০৩	৪৩৬
কোচবিহার	৪৭১	৮৩৫	৪৩৬	৮৮৬	৪৩৮	৮৭৩

পরিশিষ্ট (ঝ) : কৃষিবর্গে জাতিভেদ

	মালিক চাষী	ভাগচাষী	খেতমজুর	খাজনাভোগী
কৃষিজীবী সাধারণ জনগণ	৮০,২৩,৭৫৭	২৯,৮০,৪০২	৩০,৪১,৮৮১	১,৪৯,১২১
তপশীলী জাতির লোক	১২,৩৭,৮৭৯	৮,৭৪,৯৪৪	১১,৪১,৯৫৬	১০,১৬১
খণ্ডজাতির লোক	৩,২৭,৩৫৩	৩,৪২,০২০	২,৫০,৯১২	৯৩৬
মোট জনসংখ্যার শতাংশে তপশীলী ও খণ্ডজাতি	১৯·৫	৪০·৮	৪৫·৮	৭·৪